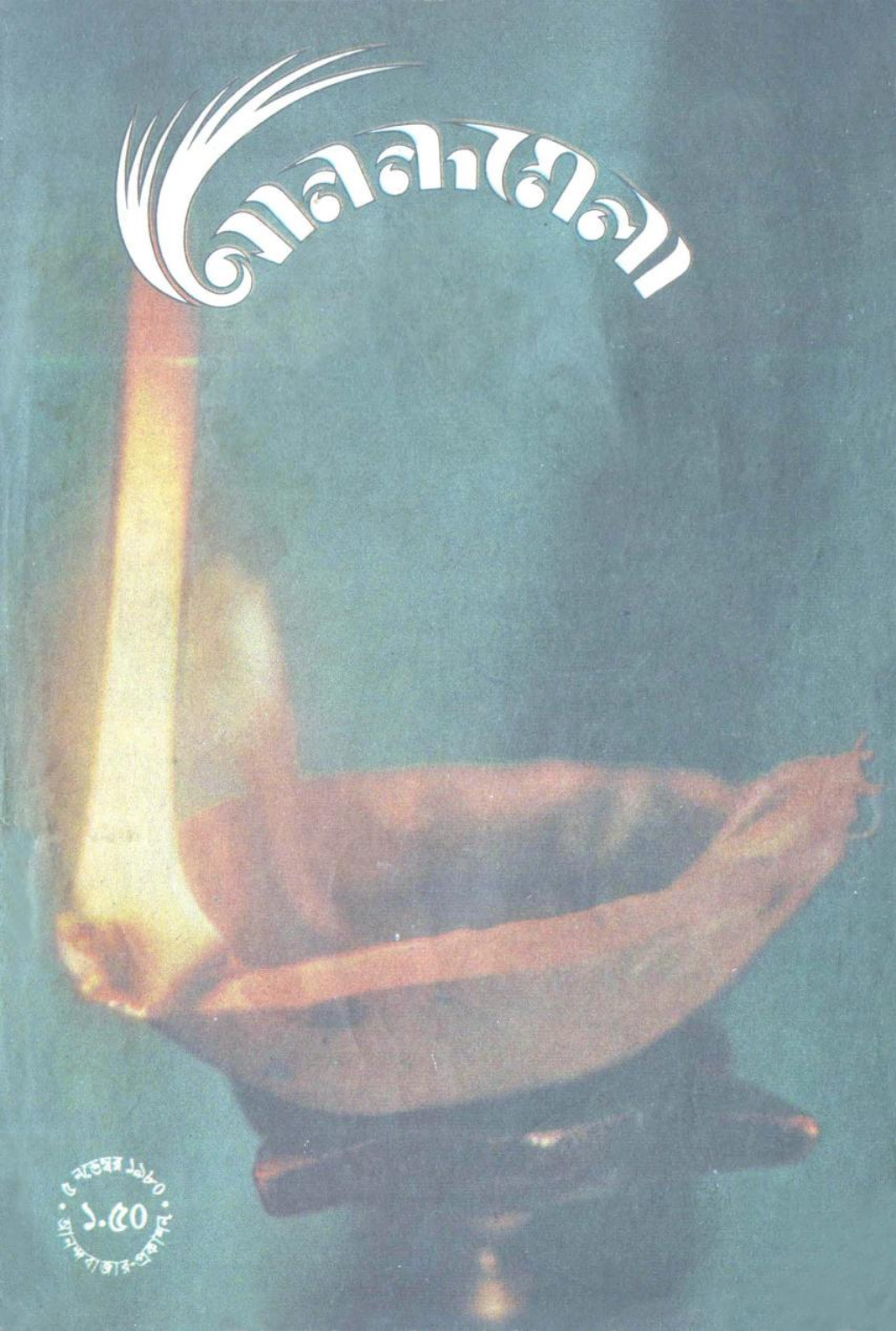

আনন্দমেলা
৬ অক্টোবর ১৯৮০
১.৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন

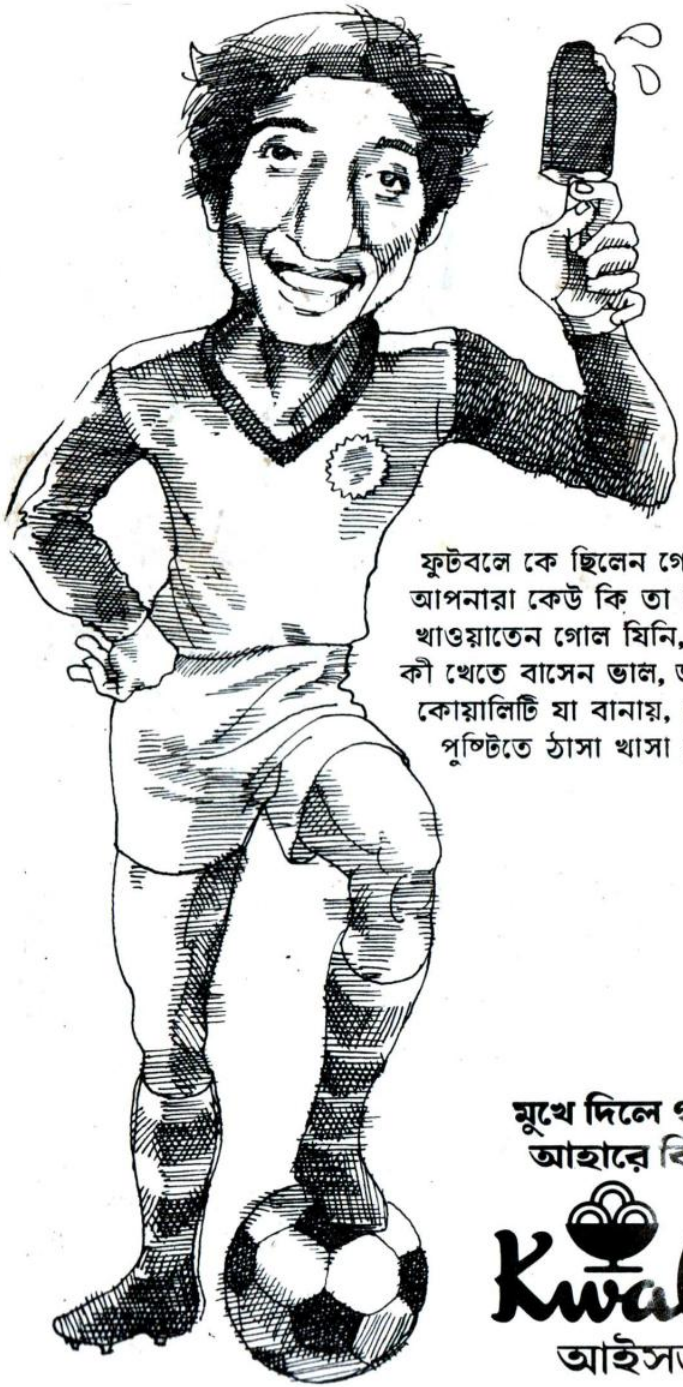

ফুটবলে কে ছিলেন গোলের গোসাঁই ?
আপনারা কেউ কি তা জানেন মোশাই ?
খাওয়াতেন গোল যিনি, সেই খেলোয়াড়
কী খেতে বাসেন ভাল, জানা আছে কার ?
কোয়ালিটি যা বানায়, চুনী খান তা-ই,
পুষ্টিতে ঠাসা খাসা ঠাণ্ডা মালাই।

মুখে দিলে গলে যায়
আহারে কি পুষ্টি !

Kwality
আইসক্রীম

আনন্দমেলা

১৯ কার্ত্তিক ১৩৮৭ • ৫ নভেম্বর ১৯৮০ • ৬ বর্ষ • ১৪ সংখ্যা

ছড়া
রাজা আর সেপাই । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৯
ভুল হয়েছে । শমীন্দ্র ভৌমিক ৪২
ভূ-গোলমাল । মৃণালকান্তি দাশ ৪৬
গল্প
ঘুমের মধ্যে ঘণ্টেদা । বীরেন্দ্র দত্ত ১০
টাট্টু । কার্ত্তিক ঘোষ ৪৩
স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ১৫
উপন্যাস
রুকু-সুকু । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২৬
কে । বিমল মিত্র ৩৬
খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল ।
প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (পি.কে.) ৩১
ভ্রমণ-কাহিনী
শেকসপীয়রের বাড়িতে । প্রদীপকুমার ভৌমিক ৪
চিত্রকাহিনী ও কমিকস
সদাশিব ২০, রোভার্সের রয় ২২, টিনটিন ২৪
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪
খেলাধুলো
বড় হওয়ার পথে সমর । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৫০
কিং-ই রাজা । অলোক দাশগুপ্ত ৫৩
লেখাপড়া
ভাষার খেলা । কুন্তক ৫৭
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৫৯
লোরেটো হাউসের ভাইস প্রিন্সিপাল কী বলেন ৬২
ক্লাস টেন্-এর ফার্স্ট গার্ল ৬৩
অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, ছবির মজা ৪২
তোমাদের পাতা ৪৭, মণিমেলার খবর ৫৫
আঁকো-শেখো ৬৬
সমর ভট্টাচার্যের পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪৯
প্রচ্ছদ বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাণাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ।

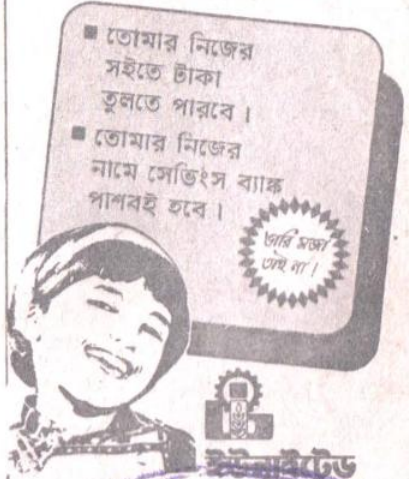

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা । পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আ—মেলা ১১/১

সমাধি-প্রস্তরে উৎকীর্ণ কবির শেষ ইচ্ছা

শেকসপীয়রের বাড়িতে

প্রদীপকুমার ভৌমিক

বার্মিংহাম থেকে বাসে চেপে এলাম নিউ স্ট্রীট রেল স্টেশনের গায়ে মিডল্যান্ড রেড বাস টার্মিনালে। নেমে দেখি স্ট্র্যাটফোর্ডে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীর সংখ্যা কম নয়। দাঁড়িয়ে পড়লাম কিউতে। একটু পরেই এল লাল টুকটুকে একটি বাস। ৮৫ পেনির টিকিট কেটে জানলার ধারে গিয়ে বসলাম। বাসে উৎসাহী ছেলেমেয়েদের ভিড়। গন্তব্য মহাকবি শেকসপীয়রের স্মৃতিতীর্থ।

বার্মিংহাম থেকে বাসে এক ঘণ্টার স্ট্র্যাটফোর্ড। স্ট্র্যাটফোর্ডে পৌঁছে বাস-অফিসের জিম্মায় আমার তল্পিতল্পা জমা রেখে হালকা হলাম অনেকখানি।

ঝকঝকে সুন্দর সকাল। আজ নাকি অনেকদিন বাদে এখানে সূর্যের মুখ দেখা গেল। শীতের দিনে এ এক বিরল সৌভাগ্য।

মহাকবি শেকসপীয়র

পথেঘাটে খুশির জোয়ার।

প্রথমে এলাম সরকারি তথ্যকেন্দ্রে। পথের নিশানা বুঝে নিলাম। তারপর ভিড়ের স্রোতে এগিয়ে চললাম হেনলি স্ট্রীট বরাবর। পথের দুধারে দোকানিরা নানারকমের পশরা সাজিয়েছে। সে-সব দেখতে-দেখতে এসে হাজির হলাম মহাকবির বাসভবনের দোরগোড়ায়। এখানেও কিউ। প্রথমে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হল। ১৫৬৪ সালে শেকসপীয়র এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভেবে বিচিত্র এক অনুভূতির সঞ্চার হচ্ছিল সারা দেহে। এই গৃহে মা মেরি আর্ডেন ও বাবা জন শেকসপীয়রের স্নেহযত্নে মহাকবির বাল্যজীবন কাটে। মাত্র ১৮ বছর বয়সে পাশের স্যাট্‌রি অঞ্চলে অ্যানি হ্যাথওয়েকে বিয়ে করার পর কবি স্ট্র্যাটফোর্ড ছেড়ে লণ্ডনে গিয়ে বসবাস করেন। পরবর্তীকালে স্ট্র্যাটফোর্ডে ফিরে নিউ প্লেস নামক একটি বাড়ির মালিক হন শেকসপীয়র। জীবনের বাকি দিনগুলো তিনি সেখানে কাটান। ১৮৪৭ সাল নাগাদ সরকার কবির বাসভবন সংরক্ষণের দায়িত্ব নেন।

বাসভবনে প্রবেশের পরে গাইড প্রথমে নিয়ে এলেন একতলার বসার ঘরে। পুরু কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো নলখাগড়ার ওপর চুনবালি ঠাসা দেয়াল চারদিকে। সিলিংও ওই একই মালমশলায় তৈরি মনে হল। চৌকো বড়-বড় পাথরের অমসৃণ মেঝে আর ইট ও পাথরে গড়া ফায়ারপ্লেস ছাড়া এ ঘরে আর বিশেষ কিছুই নেই। ঘোরানো সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম দোতলার একটি ঘরে, এই ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহাকবি। নিচু, অসমান সিলিং, ঘরের মেঝে কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি। এক কোণে একটি চুল্লি। শিকল দিয়ে ঘিরে রাখা একটি অংশে শিশুদের ঘুমপাড়ানি খাট, তার পাশে একটি প্রমাণ-আকারের বড় খাট। মেঝের কিছুটা অংশ কার্পেটে ঢাকা। গাইড বললেন, এই ছোট খাটটিতে শিশু উইলিয়ামকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন মা মেরি।

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য এই ঘরের একটি জানলা। জানলার কাঁচের পাল্লায় অসংখ্য দর্শক

অ্যাভন নদীর তীরে গাওয়ার মেমোরিয়াল, উঁচু স্তম্ভে শেকসপীয়রের মূর্তি

২১ লাখ নতুন লোক গত বছরে ডেট কেক ব্যবহার আপন করে নিয়েছেন

এর এক খাস কারণ — ডেটের দারুণ ধোয়া

আজ, আগের থেকেও বেশী লোক ডেট কেকের দারুণ ধোয়া পছন্দ করছেন; ওঁরা বলেন, এটি যেমন চোখ ধাঁধানো সাদা করে, তেমনি অনেক বেশী সাশ্রয়ও পড়ে।

উৎকৃষ্ট ডিটারজেন্ট কেকের বিকাশ মাধন	
	নতুন গ্রাহক
ডেট কেক	২১,০০,০০০
এর পরের উৎকৃষ্ট কেক	১৪,০০,০০০
মোট ৪১,০০,০০০ নতুন গ্রাহক	

উৎস: রিটেল স্টোরের অডিট রিপোর্ট: জানুয়ারী—ডিসেম্বর, ১৯৭৯, ব্যবহারের ভিত্তি: ১টি কেক, প্রতি মাসে, প্রতি ব্যক্তি

২১,০০,০০০ নতুন লোক তো ডেট কেক ব্যবহার করছেন।
কি, আপনিও তো?

ডেট কেক

ব্যবহার করুন
সাদাকে আপন করুন

Shilpi-DM-14A/80 Ben

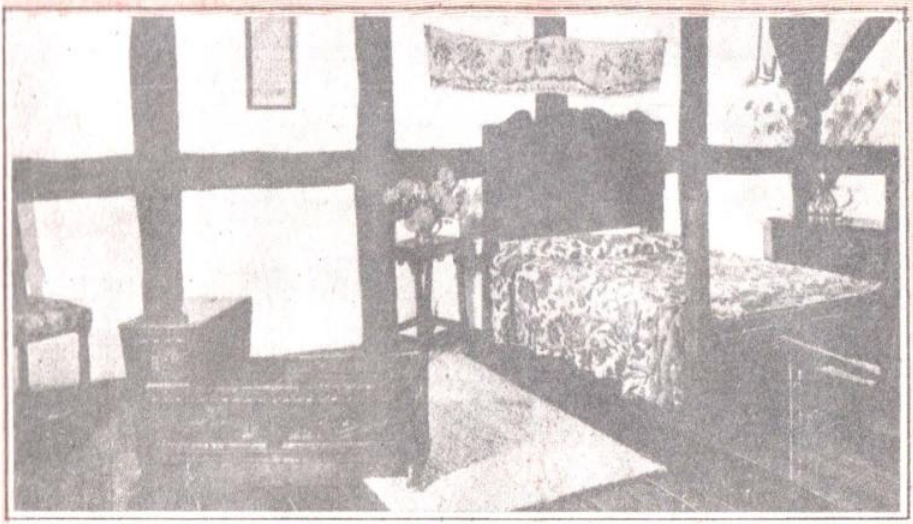

শেকসপীয়রের জন্মগৃহ, আজও সেই সময়ে সজ্জিত

ও অতিথির হাতের লেখা। কাঁচের গায়ে শক্ত শলাকা দিয়ে লেখা হয়েছে। এইসব লেখার মধ্যে খুঁজে পেলাম স্যার ওয়াল্টার স্কট, কার্লাইল, আইজ্যাক ওয়াটস প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাতের লেখা ও স্বাক্ষর। এখন অবশ্য দর্শকদের নামঠিকানা লেখার জন্য বিশেষ একটি বই আছে।

দোতলার অপর একটি ঘরে আছে মহাকবির বহু রচনার পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত বইয়ের প্রথম সংস্করণ। কবি-পরিবারের সম্পত্তি-সংক্রান্ত অনেক দলিলপত্র, কবির জন্ম-সংক্রান্ত চার্চের নথি আর মানপত্রে এ ঘরের দেওয়াল ভর্তি। এইসব মূল্যবান নথিপত্র দেখতে-দেখতে কবির ঘটনাবহুল জীবন ও কবি-পরিবারের অতীত-জীবনের অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম আমি।

কিছুক্ষণ পরে নেমে এলাম একতলার রান্নাঘরে। সেই আমলের রান্নার নানা সামগ্রী আর বাসনপত্র সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এ-ঘরে। ঠিক মাঝখানে একটি 'বেবি মাইণ্ডার'। ঘরের কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে একটি লম্বা ধাতুদণ্ড। মেঝের ছোট গর্তে এর শেষ অংশটা ঢুকে আছে। দণ্ডটিকে বেশ সহজেই ঘোরানো যায়। এর নীচের দিকে জুড়ে দেওয়া আছে অপর একটি আনুভূমিক অংশ। তার আংটায় চঞ্চল শিশুকে বেঁধে রেখে গৃহকর্মী হেঁশেলের কাজ [illegible]

দূরে রাখার জন্য সে-যুগের ইংল্যাণ্ডে এই ধরনের ব্যবস্থা চালু ছিল।

বাসভবনের ভেতরে আর কিছু দেখার ছিল না। অতিথি-পুস্তিকায় মাতৃভাষায় স্বাক্ষর রেখে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম সুন্দর গালিচা-বিছানো বাগানে।

এই বাগানের ঠিক গায়ে গড়ে উঠেছে 'শেকসপীয়র সেণ্টার'। মহাকবির চতুর্থ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬৬ সালে শেকস-পীয়র বার্থপ্লেস ট্রাস্ট ও বিশ্বের শেকসপীয়র অনুরাগীদের সৌজন্যে এই কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। সেণ্টারের ভেতরে এক চক্কর ঘুরে এলাম। এখানকার গ্রন্থাগার গবেষকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। মহাকবির নিজের ও তাঁর সম্পর্কে লেখা যাবতীয় রচনার এক বিরল সংগ্রহ এখানে রয়েছে। সেণ্টারের প্রবেশ-পথে শেকসপীয়রের নাটকের বিখ্যাত চরিত্রগুলির প্রতিমূর্তি কাঁচের গায়ে খোদাই করে জীবন্ত করে তুলেছেন শিল্পী জন হাটন।

হেনলি স্ট্রীট ধরে জোর কদমে এসে পড়লাম অ্যাভন নদীর 'ওয়াটারসাইডে'। গন্তব্য মহাকবির সমাধিমন্দির হোলি ট্রিনিটি গির্জা।

অ্যাভনের টলটলে নীল জলের বুকে রাজ-হাঁসের মেলা। নদীর পারে খোলা আকাশের নীচে চা-কফির দোকানে একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় দেখতে পেলাম উঁচু এক স্তম্ভের

এই বাড়িতেই শেকসপীয়রের জন্ম হয়েছিল

ওপর উপবিষ্ট মহাকবির মূর্তি। এর নাম 'গাওয়ার মেমোরিয়াল'।

একটু পরে বিশ্ববিখ্যাত রয়াল শেকসপীয়র থিয়েটারকে বাঁয়ে ফেলে এগিয়ে গেলাম সামনে। বছরের প্রায় আট মাস মহাকবির বিভিন্ন নাটক অভিনীত হয় এখানে।

অ্যাভনের ঠিক ধারে হোলি ট্রিনিটি গির্জার চূড়া দূর থেকে দেখতে পেলাম। পরিচ্ছন্ন বাগানের ভেতর দিয়ে গির্জার প্রবেশ-পথ। দর্শনী দিয়ে গির্জায় এলাম। দুদিকের দেয়ালের রঙিন কাঁচে যীশুর সচিত্র জীবন-গাথা। আর আছে দেবশিশুদের ছবি।

সবশেষে দেখলাম ফুলের স্তবকে ঢাকা মহাকবির সমাধি। তাঁর শেষ-শয্যার একদিকে স্ত্রী অ্যানি হ্যাথওয়ে এবং অপর দিকে কন্যা ও জামাতা সুসানা হল ও জন হলের সমাধি। কবির সমাধির ঠিক ওপরের বাঁদিকের দেওয়ালে তাঁর একটি আবক্ষমূর্তি আছে। মূর্তির এক হাতে পুঁথি, অপর হাতে পালকের কলম।

কবির স্মৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে বেরিয়ে এলাম ট্রিনিটি চার্চ থেকে। এবার আবার বার্মিংহাম ফেরার পালা।

গাইয়ে বাবা একদিন হারমোনিয়াম বাজিয়ে খেয়াল গাইছেন, পাঁচ বছরের ছেলে কাছে বসে একমনে শুনছে। বাবা কী-একটা কাজে উঠে গেলেন। ফিরে এসে শোনেন, হারমোনিয়ামের রীড টিপে টিপে ছেলে সুরটা ঠিক গলায় তুলে ফেলেছে। এই ছেলেটিই আট বছর বয়সে একজন বক্তার অনুকরণ করে দারুণ এক বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিল। যখন সে ক্লাস সিক্সে পড়ে, একদিন ক্লাসের বেশির ভাগ ছেলেই পড়া তৈরি করে আসেনি। মাস্টারমশাই তাদের এক কোণে দাঁড় করিয়ে পড়া তৈরি করতে বললেন। ছেলেটির কাছে বই ছিল না, অন্যদের পড়া শুনেই তার মুখস্থ হয়ে গেল। এই ছেলেটিই বিখ্যাত কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

রাজা আর সেপাই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেপাই এসে যেই দাঁড়াল,
রাজা বললেন, সেলাম!
সেপাই বলল, হঠাৎ যেন
বিড়ির গন্ধ পেলাম?
রাজা বললেন, রামো, রামো
বিড়ি তো নয়, মুলো!
সেপাই বলল, গোঁফের ডগায়
জমছে কেন ধুলো?
রাজা বললেন, কমলা-আপেল
আনব কয়েক ঝুড়ি?
সেপাই বলল, কোথায় আমার
পেঁয়াজ-লঙ্কা-মুড়ি?
রাজা বললেন, বসুন আগে,
এই যে সিংহাসন,
সেপাই বলল, নোংরা ওটা
মাছিতে ভন্‌ভন্‌!
রাজা বললেন, মাছি কোথায়,
ওগুলো সব পাখি,
সেপাই বলল, কাজে-কম্মে
দিচ্ছ খুবই ফাঁকি!
রাজা বললেন, নাচার হুজুর
দেখাচ্ছি পা তুলে,
কত বড় ফোস্কা, আমার
জুতো দিন-না খুলে!

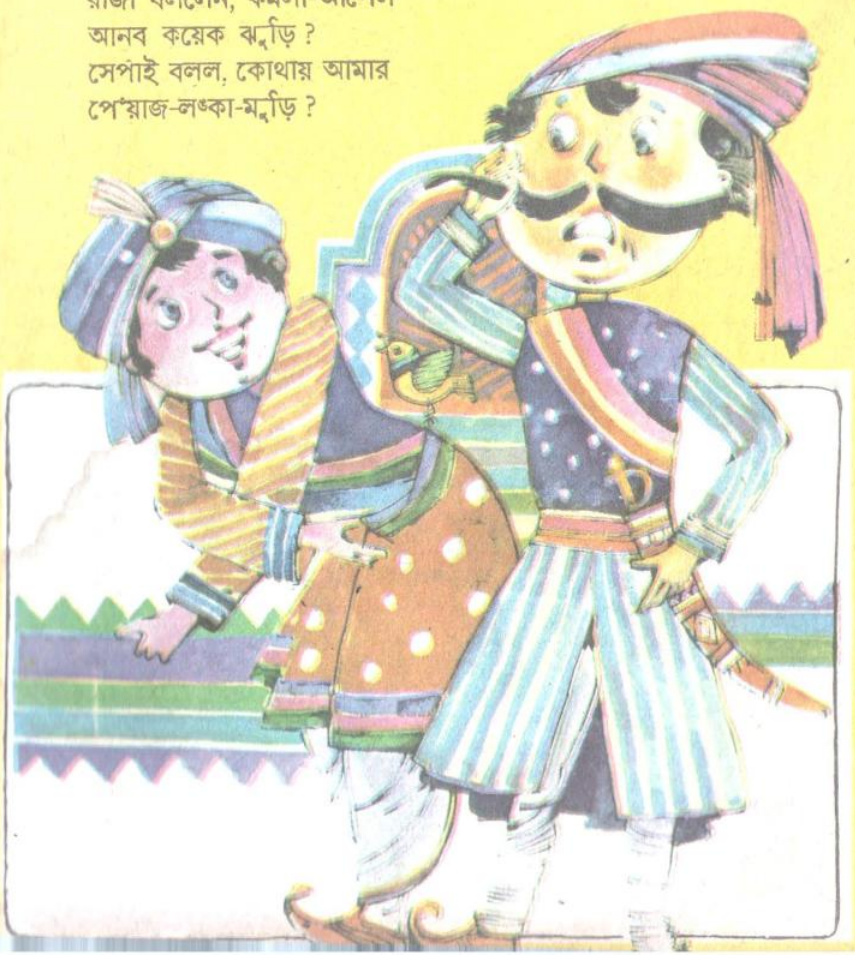

ঘুমের মধ্যে ঘণ্টেদা

বীরেন্দ্র দত্ত

আমাদের স্কুলের ঘন্টেদা তিনবার ফেল করার পর আমাদের থেকে চার ক্লাস উঁচুতে পড়ত। ওর একটা ভাল নাম নিশ্চয়ই ছিল. কিন্তু আমরা প্রথম যে নাম শুনি তা হল ঘন্টারাম। ঘন্টেদার বাবা ছিলেন গ্রামের একজন গরিব পুরোহিত। ঘন্টেদা তার বাবার সঙ্গে যজমান-বাড়ির পুজো-আচ্চায় যেত। পুজোর পাওয়া প্রসাদ, নৈবেদ্য-রাখা পোঁটলা-পুঁটলি বয়ে আনত। কখনও কোসা-কুসি, ঘন্টা। সেই থেকে কারা যেন তার নাম বানিয়ে দিল ঘণ্টারাম। আর তা থেকে আমরা যারা ছোট ছিলুম, আমাদের সকলের হয়ে গেল ঘন্টেদা।

ঘন্টেদার চেহারার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। একসঙ্গে অনেক খেতে পারত ঘন্টেদা. তাই বেঁটে হলেও বেশ মোটাসোটা চেহারা ছিল ওর। চওড়া কাঁধ, ছোটখাট ঘাড়, তার ওপর চওড়া মুখ-মাথা। মাথায় খুব ছোট করে ছাঁটা-চুল। নাকটা থ্যাবড়া, চোখ ছোট, ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক মোটা। গায়ের রঙ ভীষণ কালো।

সেই ঘন্টেদার ঘুম। কারও ঘুমের কথা উঠলে নিশ্চয়ই আগে কুম্ভকর্ণের কথা মনে হবে। কিন্তু ঘন্টেদার ঘুম সেরকম নয়। ঘুমের ব্যাপারে ঘন্টেদার অভ্যেসটা স্বাস্থ্য বইয়ের নির্দেশের মতো—রাত দশটায় শোয়া, ভোর ছটায় ওঠে। খাওয়ার পরে দুপুরে ঘুমোত না। বাবার ফাই-ফরমাশ খাটত, সংসারের সবরকম কাজ করত, বাকি সময় পড়াশুনা নিয়ে থাকত। কিন্তু ঘন্টেদা স্কুলে কিছুতেই ক্লাসে উঠতে পারত না। অথচ আমরা যখন ক্লাসে উঠতে উঠতে ঘণ্টেদাকে ধরে ফেলেছি প্রায়, তখনি শুনি ঘন্টেদা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে গেছে! আমরা সকলে অবাক! কী করে পাস করল? সে আর এক ইতিহাস, সে-কথা আপাতত থাক।

এখন ঘন্টেদার ঘুমের কথায় আসি। ঘন্টেদার ঘুমের স্বভাবটা ছিল বিচিত্র। যেমন. চওড়া বিছানায় শুয়ে ঘুমের মধ্যে ঘন্টেদা কখনও কখনও অঙ্কের যোগ, বিয়োগ বা গুণিতকের চিহ্ন হয়ে যেত। কীভাবে? কারও ভোরে ঘুম ভাঙলে দেখতে পেত, ঘন্টেদা চওড়া বিছানায় গড়াতে গড়াতে এক ভাইয়ের ওপর এমনভাবে শুয়েছে, ঠিক যেন যোগ-চিহ্ন বা গুণ-চিহ্ন। কখনও হয়ে যেত বিয়োগ-চিহ্ন। আবার কখনও কারও মাথার কাছে গড়িয়ে গিয়ে ইংরিজি টি এ ভি এল ইত্যাদি। কখনো পঁয়তাল্লিশ বা নব্বই ডিগ্রি কোণ করত কারও সঙ্গে।

আরও অনেক ব্যাপার করত ঘন্টেদা। একবার তো কোন্ একজন কুটুম্ব প্রথম ওদের বাড়িতে এসেছিল বেড়াতে। তার পরের দিন সকালে

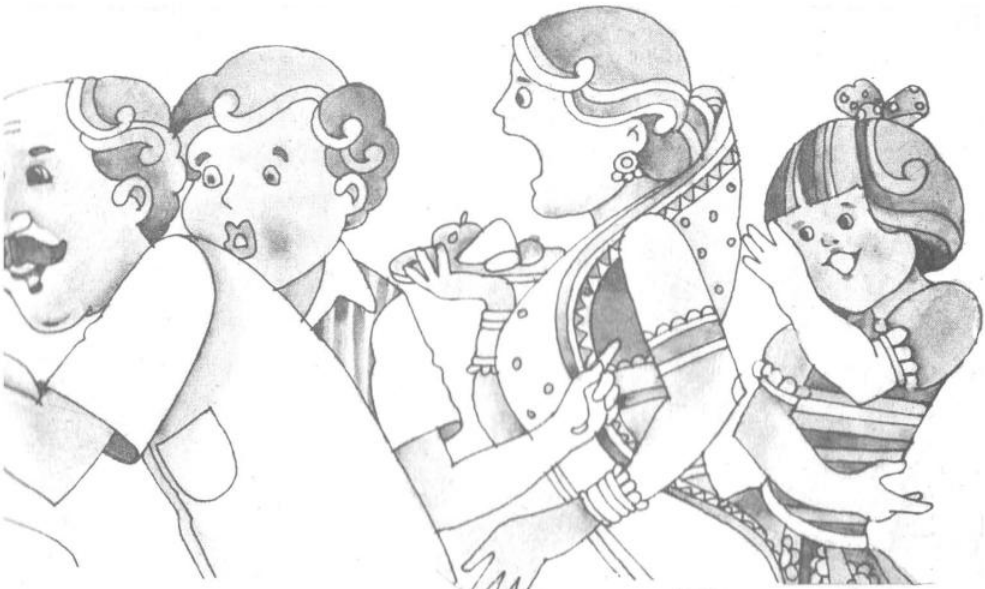

পায় না। কোথায় গেল! বাড়ির লোক ভাবনায় অস্থির। শেষ পর্যন্ত কুটুম্বের বাড়িতে লোক যায়। দেখে, সেই কুটুম্ব শয্যাশায়ী। মুখে ব্যান্ডেজ, হাতে প্লাস্টার। রাতে ঘন্টেদার পাশে শুয়েছিল সে। ঘন্টেদা এমন হাত-পা ছুঁড়েছে যে, সে ভোরেই ভাঙা হাত মুখ নিয়ে ভয়ে লজ্জায় পালিয়ে এসে বেঁচেছে।

কিন্তু কিছু করার নেই। ঘন্টেদা ঘুমের মধ্যে কখন যে এসব করে ও নিজেই কিছু জানে না। ঘুমের মধ্যেও কেউ-কেউ নাকি দাঁড়িয়ে পাশ ফেরে—এসব ঠাট্টার কথা বলে। ঘন্টেদার এসব সত্যি-সত্যি হত কি না জানি না, তবে ঘন্টেদার মা রাতে শোবার সময় মাঝে-মাঝে তার পা কোনও কিছুর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে শোয়াতেন। কারণ ঘন্টেদার নাকি ঘুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ার স্বভাব। তারপর হেঁটে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করত। এ-ছাড়াও বড় বড় গুণ, ঘন্টেদা একটানা বসে থেকেও সাপের ঘুম সেরে নিতে পারত, আর তার মধ্যে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতে পারত, ঠাকুর-দেবতাদের মতো কথা বলে যেত!

ঘন্টেদার বাবা ছেলেকে পুরুতগিরি করাবেন না। চাকরি-বাকরি করে কিছু পয়সা যাতে আনতে পারে, তার জন্যে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর টাইপ শেখার স্কুলে ভর্তি করালেন। টাইপ তো কিছুই শেখে না। কিন্তু দেখা যায়, ঘুমের মধ্যে টাইপের অভ্যেসটা ঠিক আছে। এক গরমের দিনে ঘন্টেদা ঘুমের মধ্যে ভাইয়ের পিঠে আঙুল বসিয়ে টাইপ করে গেল, মুখে টক-টক শব্দ। মানে, টাইপ শেখায় এমন নিষ্ঠা যে, ঘুমের মধ্যেও তার চর্চাটা রেখেছিল।

শেষে চাকরি যখন জুটল না, বাবার পুজোআচ্চার কাজেই ঘন্টেদা বেশ ডুবে গেল। তখন আর এক উপসর্গ দেখা দিল ঘুমের মধ্যে। স্বপ্নের মধ্যে ঘন্টেদা ঠাকুর-দেবতাদের সঙ্গে কথা বলত।

এই ঘুমের মধ্যেই ঘন্টেদার জীবনে এমন একটা মজার ঘটনা ঘটল, যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। ঘটনাটার কথা ঘন্টেদার বাবা-মা ও আর সব প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে যা শুনেছি, তা সাজিয়ে নিলে দাঁড়ায় এইরকম!

ঘন্টেদার অবস্থা একসময় এমন হয়ে দাঁড়াল যে, বাবা-মা ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন ওর ওপর। এত বুদ্ধি মোটা যে সব কাজেই পেটুক ঘন্টেদা গোলমাল পাকায়।

একদিন ঘন্টেদার বাবা ভীষণ বকলেন ছেলেকে। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করার সময় কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে মানে হোক না হোক ঠিক নিজের মতো একটা উত্তর দিয়ে দেয় ঘন্টেদা, কিন্তু জেগে থাকলে হাজার

বেশীর ভাগ মায়েদের চিন্তা
বাচ্চাদের খাবারে যথেষ্ট পুষ্টি হ'ল কিনা।
কিন্তু সুচিত্রা নিশ্চিন্ত।
উনি বলেন: "আমি ওদের প্রতিদিন হরলিক্স খাওয়াই, ডাক্তারবাবু বলার পর থেকেই হরলিক্স ওদের দৈনন্দিন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, আমি জানি, হরলিক্স ওদের সুস্থ-সবল রাখতে সাহায্য করে,
আপনিও ছেলেমেয়েদের রোজ হরলিক্স খাওয়ান তো?"
Horlicks
THE IDEAL FOOD DRINK
মহান শক্তিদাতা
"পুষ্টির একটি মূল উৎস হ'ল হরলিকস্। পুষ্টিকর খাদ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে তৈরী। হরলিকস্‌এর উৎকৃষ্টতা বহুবছর ধরে বিখ্যাত। তাই তো দিনের পর দিন আপনার পরিবারকে সুস্থ, সবল আর সক্রিয় রাখতে আমি হরলিকস্ খেতে পরামর্শ দিই"
হরলিক্স একটা রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

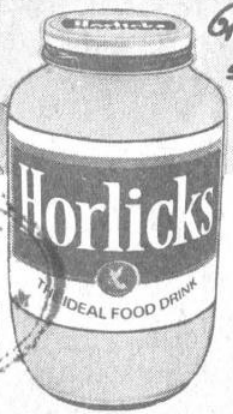

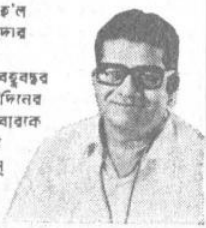

লোক রেগেমেগে ওকে যাই বলুক না কেন, ও শব্দটি পর্যন্ত করে না।

সকাল থেকেই ছিল গুমোট গরম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কি কথায় ঘন্টেদার বাবা ঘন্টেদার ওপর ভীষণ রেগে গেলেন। রাগের মাথায় ঘন্টেদার বাবা অনেক কিছু বললেন, কিন্তু ঘন্টেদা কোনো উত্তর দিল না।

শেষে ঘন্টেদার বাবা বললেন, "এই, তুই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা, তোর মতো ছেলে থেকেই বা আমার লাভ কী?"

ঘন্টেদা বাবার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

"যা, এখনি তুই বাড়ি থেকে বেরো যা। পয়সাকড়ি কিছু উপায় করে আনলে এ বাড়িতে এসে থাকবি, না হলে ঢুকবি না।" ঘন্টেদার বাবা থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে সরে গেলেন সামনে থেকে।

ঘন্টেদা চুপ করে বসে রইল কিছু সময়। শেষে ওর মা ওকে ডাকতে এলে ও হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মায়ের দিকে একবার তাকিয়েই বেরিয়ে গেল বাইরে।

মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোথায় যাচ্ছিস রে খোকা?"

ঘন্টেদার কোনো জবাব নেই।

মা ভয়ে ভয়ে বললেন, "খোকা, যাস না।"

মায়ের কথা কানেই নিল না ঘন্টেদা। সারাদিন একটানা হাঁটল। এ-গ্রাম ও-গ্রাম পেরিয়ে সন্ধের মুখে কোন্ গ্রামে পৌঁছল তাও সে জানে না। অমাবস্যার রাত। তাই সন্ধে থেকেই ঘন অন্ধকার চেপে বসল চারপাশে। সেই অন্ধকারে ঘন্টেদা গ্রামের প্রান্তে এসে পৌঁছল। একটু দূরে একটা তালপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর। ওদিকে একটা পুরনো মন্দির। রাস্তার ধারে একটা ঝুড়ো বটগাছ। বটগাছের নীচে নিকোনো বেদি। একপাশে কয়েকটা পাথরের নুড়ি, সিঁদুর মাখানো।

সারাদিন একটানা হাঁটার পরে ঘন্টেদা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ওই বেদির ওপর শুয়ে পড়ল ঘন্টেদা। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, আর কখন যে ভোর হল, ও জানে না।

ভোরের দিকে কয়েকজন গ্রামের লোক ওই বেদিতে একজন অচেনা মোটাসোটা ছেলেকে বসে থাকতে দেখে অবাক! ঘন্টেদার শরীর ধুলো-মাটিতে সাদা। শুয়ে ঘুমোবার সময় চারপাশ গড়িয়েছে ও।

তখনও বসে বসে ঘুমোচ্ছে ঘন্টেদা। কী যেন স্বপ্ন দেখছে। হঠাৎ বলল, "তোরা কারা? এখানে বোস্।"

গ্রামের নিরীহ লোকগুলি একটু এগিয়ে এল। দু'চোখের বিস্ময় কাটেনি। "তুমি কে বাবা?"

"আগে বোস্, ফুল-বেলপাতা নিয়ে আয়।"

"সব এনেছি বাবা!"

"এখানে এসেছিস কেন?" বিড় বিড় করে ঘন্টেদা। "শিবের পুজো না দিলে কি কালী সন্তুষ্ট হয়?"

লোকগুলো এসব কথায় ভয় পেল ভীষণ। বসে পড়ল। "আজ আমরা যে বাবা মহেশ্বরকেই পিতিষ্ঠে করব। আমরা যে এত-দিন ভুল করেছি বাবা!"

"মঙ্গল হোক।"

স্বপ্নের মধ্যে ঘন্টেদা শুধু বিড়-বিড় করে যায়, "আশীর্বাদ করি, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক!"

গ্রামের লোকগুলো নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল বার কয়েক, তারপর সামান্য দূরত্ব রেখে ঘন্টেদাকে ঘিরে বসে পড়ল। আজ ভোরেই বেদির কাছে কয়েকটি পাথর প্রতিষ্ঠা করার দিন। ওরা তৈরি হয়েই এসেছিল। ঝটপট নৈবেদ্য সাজিয়ে ফেলল চারপাশে। ধূপ-ধুনো জ্বালল।

সূর্য ওঠার আগেই ঢাকে পড়ল কাঠি, কাঁসর উঠল বেজে। আর সেই ঢাক-কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ঘন্টেদার। ঘন্টেদা অবাক! এখানে কী করে এল ও? এ-সব লোকজন কারা? ভাল করে তাকাতে গিয়ে দু'চোখ জলে ভরে উঠল ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায়।

বেলার দিকে ছেলের খবর পেয়ে ঘন্টেদার বাবা এলেন। এসে দেখেন, ছেলের সামনে পিতলের বড় থালা। তাতে টাকা-পয়সার স্তূপ। টাকা-পয়সার দিকে তাকিয়ে ঘন্টেদার বাবার দু'চোখের পাতা আর পড়ে না।

পেটুক ঘন্টেদার চোখ সামনে সাজানো ফল-মূল-মিষ্টির নৈবেদ্যর ওপর, সে ভিড়ের মধ্যে বাবাকে দেখতেই পেল না।

ছবি সুনীল শীল

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে...

এমন, যা নজরে পড়ে!

হাই পাওয়ার সার্ফে আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা. যা কাপড়ের ধূলোময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা! তাই তো. বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

লিনটাস-SU-225-1810 BC

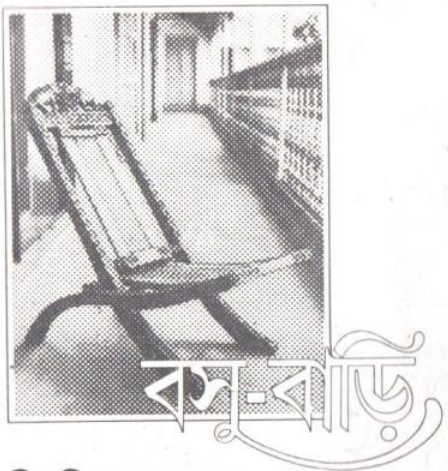

শিশিরকুমার বসু

॥ ১২ ॥

উডবার্ন পার্কে উঠে আসার পর থেকেই বোঝা গেল রাঙা-কাকাবাবু মাকে দেশের কাজে ধীরে-ধীরে টেনে আনছেন। বাড়ির সামনেই বড় মাঠ ছিল। মা'কে দিয়ে মাঠে রাঙা-কাকাবাবু মহিলা-সভার আয়োজন করাতে লাগগেন। সভায় নানারকম দেশাত্ম বোধক বক্তৃতা হত। মনে আছে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ম্যাজিক লন্ঠনের সাহায্যে রঙিন ছবি দেখিয়ে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করছেন। নীল-বিদ্রোহের সময় ইংরাজদের অত্যাচারের ছবি পরদায় ফেলা হচ্ছে, এখনও মনে গেঁথে আছে। সভার শেষে দেশাত্মবোধক গান কোরাসে গাওয়া হত। দেশবন্ধুর বাড়ির মহিলারা তাতে যোগ দিতেন। তাছাড়া হাতের সুতোয় তৈরি খদ্দরের কাপড় মা বিক্রি করতে বেরোতেন, জাতীয় তহবিলের জন্য চাঁদা তুলতে। পরে গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবার পর 'কন্ট্র্যাব্যান্ড সল্ট' বা 'বেআইনী লবণ' মা বাড়ি-বাড়ি পেঁছে দিতেন। মা'র আলমারিতে ছোট-বড় শিশিতে ঐ লবণ সাজানো থাকত দেখেছি। ঐ বস্তুটিই ছিল তখন আমাদের ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি প্রতীক।

বাবার মতো রাঙা-কাকাবাবুরও সময় ছিল কম। দেশের ও কংগ্রেসের কাজে তিনি দিনরাত ডুবে থাকতেন। সকালের দিকে তাঁকে বড়-একটা দেখতাম না, বেশি রাত পর্যন্ত খাটা-খাটুনির পর সকালে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমোতেন। দাড়ি কামানোটা ঘুমের মধ্যেই হত। কাজটা করত আমাদের বাড়ির জমকালো নাপিত-মহাশয় হরিচরণ দাস। দক্ষিণ কলকাতার অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বাড়িতে প্রতিদিন ভোরে সাইকেল চেপে সে রাউন্ড দিত। সে বেশ গর্বের সঙ্গে বলত কত বড় ও নামজাদা মানুষের দাড়ির দায়িত্ব তার হাতে। তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'দি রয়াল বারবার'। বর্ষার দিনে কলকাতা ভেসে গেলেও হরি-নাপিতের সাইকেল ঠিক চালু থাকত। এতগুলো দামি দাড়ি তো আর ফেলে রাখা যায় না!

রাঙা-কাকাবাবু খেতে আসতেন অনেক বেলায়। তাঁর খাবার সময় দক্ষিণের বারান্দায় পাথরের টেবিলে তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন আমার মা। রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা একই রকম। তিনি নিয়মিত আঁনয়ম করতেন। খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে যখন তিনি বিকেলে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেন, আমরা প্রায়ই তাঁকে দেখতে পেতাম। গায়ে ধোপ-দুরস্ত খদ্দরের কোঁচানো ধুতি ও পাঞ্জাবি, কাঁধে কোঁচানো খদ্দরের চাদর। পোশাক অনাড়ম্বর, কিন্তু পরিপাটি ও খুবই মানানসই। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি নিয়মিত নাগরা পরতেন, পরে সাধারণ চটি বা কাবলি ধরনের জুতো পরতে আরম্ভ করেন। কখনও কখনও বা তিনি খুবই গম্ভীর বা গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে নামতেন বা উঠতেন। বাথরুমে তাঁর গান কিন্তু খুবই শোনা যেত। যেমন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', 'তাতল সৈকতে বারি-বিন্দুসম', 'শিকল পরা ছল' ইত্যাদি। রাজ-নৈতিক আবহাওয়াটা কেমন, তার উপরই বোধ করি তাঁর 'মুড' নির্ভর করত। তাঁর 'মুড'-এর কথা বলতে গিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে। বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যখন হাসিঠাট্টা করতেন তখন তিনি একেবারেই ছেলেমানুষ। হয়তো বলবেন, এসো, তোমাদের ভাল একটা গল্প শোনাই, কথামালার গল্প। গম্ভীর ভাবে বলতে আরম্ভ করলেন...'একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল...'। ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝিরা যতই প্রতিবাদ করে, ততই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে থাকেন, না,

fruitrine
nutrine
ফলের স্বাদে-গন্ধে ভরা
ফ্রুট্রিন
সবারই মনোহরা!
নিউট্রিন-এর অবদান
একটি প্যাকে দশটি
চৌকো মিষ্টি গুলি
nutrine
চাকুম চুকুম
খাসা মিষ্টি দিয়ে ঠাসা!
নিউট্রিন কনফেকশনারি কোং লিঃ, পালমানের রোড, চিত্তুর-৫১৭০০২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
CAS NC 49 80 BEN C.

তিনি ঠিকই বলছেন। কখনও হয়তো আমাদের একজনের মাথা দুহাতে ধরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে মুখে কলসীতে জল নাড়ার মতো আওয়াজ করে প্রমাণ করতে চাইতেন যে, আমাদের মাথা জলে ভরা। কতরকম হাল্কা ঠাট্টা যে তিনি আমাদের জন্য আবিষ্কার করতেন তার ঠিক নেই। আর হাসির তো কোন বাঁধ ছিল না, ছোটদের সঙ্গে গড়াগড়ি দিয়ে হাসতেন।

রাঙা-কাকাবাবুর রাগের 'মুড'ও কিন্তু দেখবার মতো ছিল। সারা মুখ টকটকে লাল হয়ে যেত, কথা বেশি নয়, কিন্তু চাপা ভারী গলায় যে-কয়েকটি কথা বলতেন, তাতেই বুক কেঁপে উঠত। তবে তাঁর ধৈর্য ছিল অসীম, সেজন্য ব্যক্তিগত রাগারাগি খুব কমই ঘটত।

দেশাত্মবোধক বা ভক্তিমূলক গান শুনতে-শুনতে যখন তিনি বিভোর হয়ে যেতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখবার মতো হত। তাঁর বাল্যবন্ধু দিলীপকুমার রায় ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায়ই উডবার্ন পার্কের বাড়িতে জমিয়ে গানের আসর বসাতেন। দুই ভাই—বাবা ও রাঙা-কাকারাবু—পাশাপাশি বসে গান শুনতেন। দুজনেই একেবারে অভিভূত হয়ে যেতেন, তাঁদের মুখে এক অপূর্ব জ্যোতি ফুটে উঠত, দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।

অনেক ব্যাপারে রাঙা-কাকাবাবু এমনই সরল ও অবুঝ ছিলেন যে, তাঁর আচরণ ও কথাবার্তা অন্যদের হাসির খোরাক জোগাত। একসময় মা কলকাতার বাইরে গেছেন। ঠাকুমা বাসন্তী দেবীর কাছে গিয়ে রাঙা-কাকাবাবু নালিশ জানালেন, "দেখুন, মেজবৌদিদি বাড়িতে না-থাকলেই ধোপাটা খুব দুষ্টুমি করে, আমার পাঞ্জাবির সব বোতামগুলি ছিঁড়ে ফেরত দেয়, মেজবৌদিদি থাকলে তো এমন করতে সাহস পায় না!" ঠাকুমা খুব খানিকটা হেসে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সংসারের খুঁটিনাটি কী ভাবে চলে।

একেবারে অন্য ধরনের এক 'মুড' ও আচরণের কথা মনে পড়ল। যদিও আমি তখন খুবই ছোট, যা দেখেছিলাম তা ভোলবার নয়। রাঙা-কাকাবাবু ধীরে-ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার ভিতরের দালানে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন একটি পাথরের মূর্তি—নিশ্চল ও গম্ভীর। মা বেরিয়ে

উডবার্ন পার্কের বাড়ির সামনে রাঙা-কাকাবাবু

এলেন। রাঙা-কাকাবাবু আস্তে-আস্তে একটি কাগজের মোড়ক এগিয়ে দিয়ে থমথমে গলায় বললেন, "যতীন দাসের অস্থি, যত্ন করে রেখে দেবেন।" সকালে মা'র সঙ্গে আমরা শহিদ যতীন দাসের শোকযাত্রা দেখে এসেছি। শেষ কাজ সব সেরে শ্মশান থেকে ফিরতে রাঙা-কাকাবাবুর সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

বাড়ির বাইরেও নানা সভা ও অনুষ্ঠানে আমরা মা'র সঙ্গে যেতাম। সবগুলিই রাঙা-কাকাবাবুর উদ্যোগে। বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের সভায় তিনি বক্তৃতা করে বেড়াতেন। তাঁর সব কথাবার্তা বুঝতে পারতাম না, এবং বক্তৃতা বেশি লম্বা হলে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তাম। তবে স্বদেশী যাত্রা মুকুন্দ দাসের গান, শরীর-চর্চা, লাঠি ও ছোরা খেলা ইত্যাদির অনুষ্ঠানে বেশ উৎসাহ পাওয়া যেত। উত্তর-কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বাঙলাদেশের সবচেয়ে বড় কুস্তিগির গোবরবাবুর কুস্তি দেখেছি মনে আছে। দেশের কাজে টাকা তোলার জন্যও গান-বাজনার অনুষ্ঠানও রাঙা-কাকাবাবু করতেন। খুবই ছেলেবেলার একটি ছবি মনে আঁকা রয়েছে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক বিরাট অনুষ্ঠান হচ্ছে। মঞ্চের

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের
মিশরের নীলনদ থেকে
শহরে বেড়াতে আসা এক
কুমিরের কাণ্ড-কারখানা

কুমির সাহেব

কুমির সাহেব শহরে টহল দিতে এসে তাড়া খেয়ে গিলেই ফেললেন একটা কুকুরকে আর একটা পুলিশকে। শেষে কিন্তু বিনুর কাছেই একেবারে কাবু! যাই হোক, শহর ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরতেই বনের সমস্ত পশুপাখির দল এলো তাঁর কাছে শহরের বিবরণ শুনতে চিড়িয়াখানার বন্দী পশুদের জন্যে কুমির-সাহেবের বড়ো দুঃখ। সবাই ভীষণ পণ করলো চিড়িয়াখানা থেকে তাদের উদ্ধার করতে হবে। কি করলো তারা? সবটা মজা বইটা পড়লে!

শ্রীতাপস দত্তর ছবি। অফসেটে ছাপা। [টা. ৩.০০]

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের
মজাদার কবিতার বই

মজার কবিতা

মজার কবিতার বই-এ দেখা দিয়েছেন নামজাদা ডেন্টিস্ট সুভীষণ দত্ত। থিয়েটারের প্রচণ্ড বাতিক তাঁর। নিজের মামার পোকাদাঁত তুলতে গিয়ে এমন এক থিয়েটারী কাণ্ড করে বসলেন যে মামার প্রাণ যায়-যায়। আরও আছে। হাঁসেরা যদি ডিম না পাড়ে, তবে অমলেট খেতে অসুবিধা কোথায় যদি ডিম পাড়ে ঘোড়ারা? ইঁদুর দিয়ে লাউঘণ্ট, বাঁদর দিয়ে এঁচোড়—মজার কবিতা মজা করে পড়ে দেখো। কবিতাগুলি সুন্দরভাবে আবৃত্তিরও যোগ্য। আবৃত্তি করে অন্যকেও হাসাতে পারবে।

শ্রীশৈল চক্রবর্তীর দু-রঙের ছবি। [টা. ৫.০০]

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের
জন্তু-জানোয়ারের আজব
জগৎ নিয়ে লেখা

আষাঢ়ে স্বপ্ন অথবা জানোয়ারের মেলা * * * * * *

অনন্যসাধারণ শিশু সাহিত্যিকের লেখা অপূর্ব একটি বই-এর নূতন সংস্করণ। সবটাই স্বপ্ন কিন্তু আজব স্বপ্ন। মানুষের দেশ ছেড়ে জানোয়ারদের দেশ। বন্ধুত্ব হয় চতুর্ভুজ উল্লুকের সঙ্গে। ভালুক কাটে সিংহের চুল, দাঁতের ব্যথায় খেয়ামাঝি কুমির গরহাজির। ভালুকে সিংহে ক্রিকেট খেলা, তারপর জন্তুদেরই টাগ-অভ-ওয়ার। মানুষের ওপর ভীষণ রাগ আছে জন্তুদের; কিন্তু মানুষের সঙ্গে একটা সন্ধিও করতে চায় তারা। আর, বিবেকের দংশনে কুমিরের সে কি কান্না!

শ্রীতাপস দত্তর ছবি। অফসেটে ছাপা। [টা. ৩.০০]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
যে বইয়ের মানুষ, গাছপালা,
পশুপাখিদের মধ্যে তুমি-
আমিও লুকিয়ে আছি

শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে

একটা প্রকাণ্ড জামগাছ, তিনটি হলুদ পাখি, একটা হিংসুটে পেয়ারাচোর কাঠবেড়ালি, টাকার কুমির গিরিরাম পোদ্দার আর তার দুরন্ত মেয়ে পেল্লিকাকে নিয়ে এই কবিতার বই। হিংসুটে কাঠবিড়ালিটা হলুদ পাখি তিনটিকে জামগাছ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ে। তারপর কি হল তা জানতে পারবে বইটা পড়লে।

শ্রীতাপস দত্তর দু-রঙের ছবি, অফসেটে ছাপা।
[টা. ৫.০০]

শ্রীশৈল চক্রবর্তীর
লেখা ও আঁকা এক তাজ্জব
জগতে চলে যাওয়া
ছোট্ট মেয়ের কাহিনী

ছড়ার দেশে টুলটুলি

ছড়ার ছড়াছড়ি শিশুজীবনে। ছড়ার কত-না রাজ্য ছড়ানো চারদিকে। টুলটুলি তার সাথী দুষ্ট ঝুম্পাকে নিয়ে পথ ভুলে পৌঁছল সেই রাজ্যে ছড়ার নানা চরিত্রের সঙ্গে দেখা, যাদের কথা পড়েছে সে ছড়ায়, যেমন: কুমড়ো-পটাশ, ট্যাসগরু, হাঁসজারু, হাটিমা-টিম্-টিম্ ইত্যাদি; ঘুরল কত ছড়ার দেশে, যেমন: আরোল-তাবোল-পুর, ক্ষীরনদীর কূলে, কমলাফুলি ইত্যাদি। তারপর ফিরল মায়ের কাছে।

দু-রঙে অফসেটে ছাপা।
প্রকাশ আসন্ন।

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

উপর অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু, কাজি নজরুল ইসলাম ও দিলীপকুমার রায়। নজরুল নিজেই গাইলেন "দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার," ঘন্টা বাজিয়ে তাল মিলিয়ে। দিলীপবাবু গাইলেন তাঁর মন - মাতানো "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়"।

মা'র সঙ্গে পারিবারিক নানা অনুষ্ঠানেও তো যেতাম। লাল জামা গায়ে বিয়েবাড়িও কত গিয়েছি। কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই যে, গতানুগতিক পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান মনে ততটা দাগ কাটত না যতটা কাটত জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নানারকম অনুষ্ঠান ও সমাবেশ।

সকলেরই এ-কথা জানা যে, জেলে যাওয়া-আসা রাঙা-কাকাবাবুর জীবনের অনেকটাই জুড়ে ছিল। তাঁর গ্রেপ্তারের বা পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষের খবর আমরা প্রায়ই বড় হরফে খবরের কাগজে পড়তাম। এ-ধরনের খবর তো সুখের হতে পারে না, তবে শৈশবেও মনে-মনে দেশের জন্য রাঙা-কাকাবাবুর লাঞ্ছনাভোগে গৌরব অনুভব করতাম, এবং স্বপ্ন দেখতাম কবে আমিও ঐ গৌরবের ভাগ পাব। আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো শুনে আশ্চর্য হবে যে, আমরা খবরের কাগজ প্রথম পাতা থেকেই পড়তে আরম্ভ করতাম। সব না বুঝলেও দেশ-বিদেশের রাজনীতির খবর নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। খেলাধুলোর খবরের পাতা সে-সময় আমাদের কাছে বড় আকর্ষণ ছিল না। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ছাড়া অন্য পত্র-পত্রিকা উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ঢুকত না।

উডবার্ন পার্কের বাড়ির একতলায় বেশ বিচিত্র রকমের ভিড় লেগে থাকত। প্রথমত, বাবার পেশার সঙ্গে যুক্ত উকিল ব্যারিস্টার ও মক্কেলদের ভিড়। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির লোকদের বা কংগ্রেসীদের ভিড়—প্রধানত রাঙা-কাকাবাবুর জন্য। আর, তৃতীয়ত, নানা ধরনের সাহায্য-প্রার্থীদের সমাবেশ। কে বোস-সাহেবের কাছে এসেছে ও কে সুভাষবাবুকে চায়, সেটা সামনের দালানেই ঠিক হয়ে যেত। বাবার নাগাল পাওয়া অপেক্ষাকৃত শক্ত ছিল, কারণ কোর্টের কাজে তিনি সকাল-সন্ধ্যা খুবই ব্যস্ত থাকতেন। তারই ফাঁকে-ফাঁকে তিনি ফরওয়ার্ড কাগজ, করপোরেশন বা কংগ্রেসের জরুরি কাজ সারতেন। এই সূত্রে আর একটি পার্শ্ব-চরিত্রের কথা বলি—আমাদের খুড়ো-দাদাবাবু শৈলেন্দ্রনাথ বসু। বসুবাড়ির এই দূর সম্পর্কের আত্মীয়টি ছিলেন বাবাদের জেনারেশনের সর্বজনীন 'খুড়ো'। তিনি বাবার হাইকোর্টের 'বাবুর কাজ করতেন। কোর্টের সময়টুকু ছাড়া তিনি সারা দিনটাই আমাদের বাড়িতে কাটাতেন এবং বাড়ির নানা কাজে সাহায্য করতেন। মোটা-মোটা বাঁধানো খাতায় তিনি বাবার পেশাগত হিসাব-পত্র রাখতেন। তিনি কিন্তু প্রায়ই বাবার স্বভাব-সিদ্ধ গোছানো ও নিয়মমাফিক কাজকর্মের সঙ্গে তাল রাখতে পারতেন না এবং পিছিয়ে পড়তেন। "এই যা, ভুলে গেছি" কথাটা তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত। আর বাবা তাঁকে বলতেন, "খুড়ো, মেমারি পিল খাও, মেমারি পিল খাও।" যাই হোক, খুড়ো-দাদাবাবু ছিলেন এক অতি প্রাণখোলা ও পরোপকারী লোক। বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলেই ছিল তাঁর বন্ধু। বাবা যতই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন, পেশাগত কাজ ক্রমেই তাঁকে কমিয়ে দিতে হত। বাবা অন্য কাজের জন্য যখন 'ব্রীফ' ফেরত দিতে বাধ্য হতেন, খুড়ো-দাদাবাবু বড়ই দুঃখ পেতেন। বলতেন, "খুড়ো (মানে আমার বাবা) এমন করে ঐশ্বর্য পায়ে ঠেলছেন।" যেদিন কংগ্রেসের বড় মিটিং বাড়িতে বসত, খুড়ো-দাদাবাবু অবাঞ্ছিতের মতো ক্ষুণ্ণমনে উপরে চলে আসতেন আর আফসোস করতেন। বলতেন, "আজ তো নীচে মোহন-বাগানের ম্যাচ, 'ভূতের' রাজত্ব, আমার কিছু করবার নেই।" শেষ পর্যন্ত বাবা যখন জেলে গেলেন খুড়ো-দাদাবাবু খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আমাদের তিনি ছাড়েননি।

(ক্রমশ)

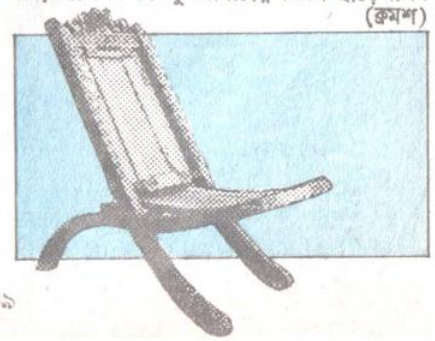

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **সদাশিব** অগ্নিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

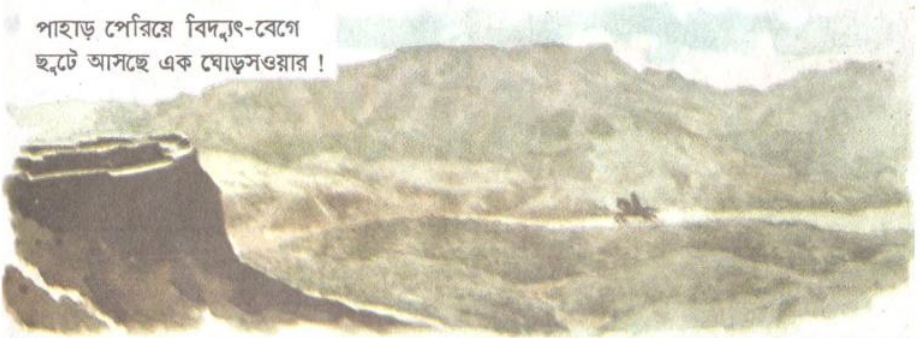

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
রয় একদম গোল পাচ্ছে না। নর্থ ভেলের সঙ্গে লীগের খেলাতেও রোভার্স তাই এক
উঃ!
ব্র্যাকিও মিস করল!
যাচ্ছেতাই!
মার্ভিন আবার বল দিয়েছে রয়কে!
পা ছোঁয়ালেই গোল হবে
কিন্তু হল কি?
উঃ!
হুঁশিয়ার!
যাচ্ছলে!
গোলে বল ঢুকছে!
সুইপারের গায়ে লেগে বল গোলে ঢুকল!
অবিশ্বাস্য!
জব্বর গোল করেছ রয়!
আরও গোল চাই!
আমি পারছি না!
রেফারী, আমি বদলি-খেলোয়াড় নামাব!
সে কী! রয় বসে যাচ্ছে!
অতঃপর
তাই তো! রজার ডিক্সন নামছে!
রয় আজ যা-তা খেলছে!
একদম যা-তা!
বসে গিয়ে ভালই হল!

সত্যি আমি পেরে উঠছিলুম না!
তাই তো দেখলুম!
ভেল কিন্তু আবার গোল করল!
যাচ্ছলে, এ কী কাণ্ড!
টু টু ওয়ান!
কিন্তু শেষ সময়ে...
ডিক্সন গোল করেছে!
টু অল!
শাবাশ!
খেলার শেষে
এবারে ফ্রান্সে গিয়ে ড্রেয়ন র‍্যাপিডের সঙ্গে ফিরতি খেলা!
মেলচেস্টার রোভার্স টীম ফ্রান্সে পৌঁছেছে
রয়, ড্রেয়নের বিরুদ্ধে কিন্তু বাঘের মতো খেলতে হবে!
দেখা যাক!
সাংবাদিক-সম্মেলনে রয়...
রয়, ইদানীং তুমি কিন্তু ভাল খেলছ না!
মনে হয়, তুমি পরিশ্রান্ত!
হতে পারে। তা এই হচ্ছে আমার লিস্ট!
খেলোয়াড়দের তালিকা
কার্টার
ব্যাক্সটার
ম্যাকে
পীক
স্লেড
গাইলস্
হলোয়ে
এলিয়ট
ক্যাসিডি
গ্রে
ওয়ালেস
বদলি
রেস মোর ফ্যান ডিক্সন
আমি নামছি না!
রয় নিজে বদলি?
রোভার্সের খেলোয়াড়রাও রয়ের সিদ্ধান্তে বিচলিত।
রয়ের নামা উচিত ছিল!
নিশ্চয়!
ফিরতি-খেলায় আগের ঘাটতি ওরা না মিটিয়ে নেয়!
এর পরে আগামী সংখ্যায়

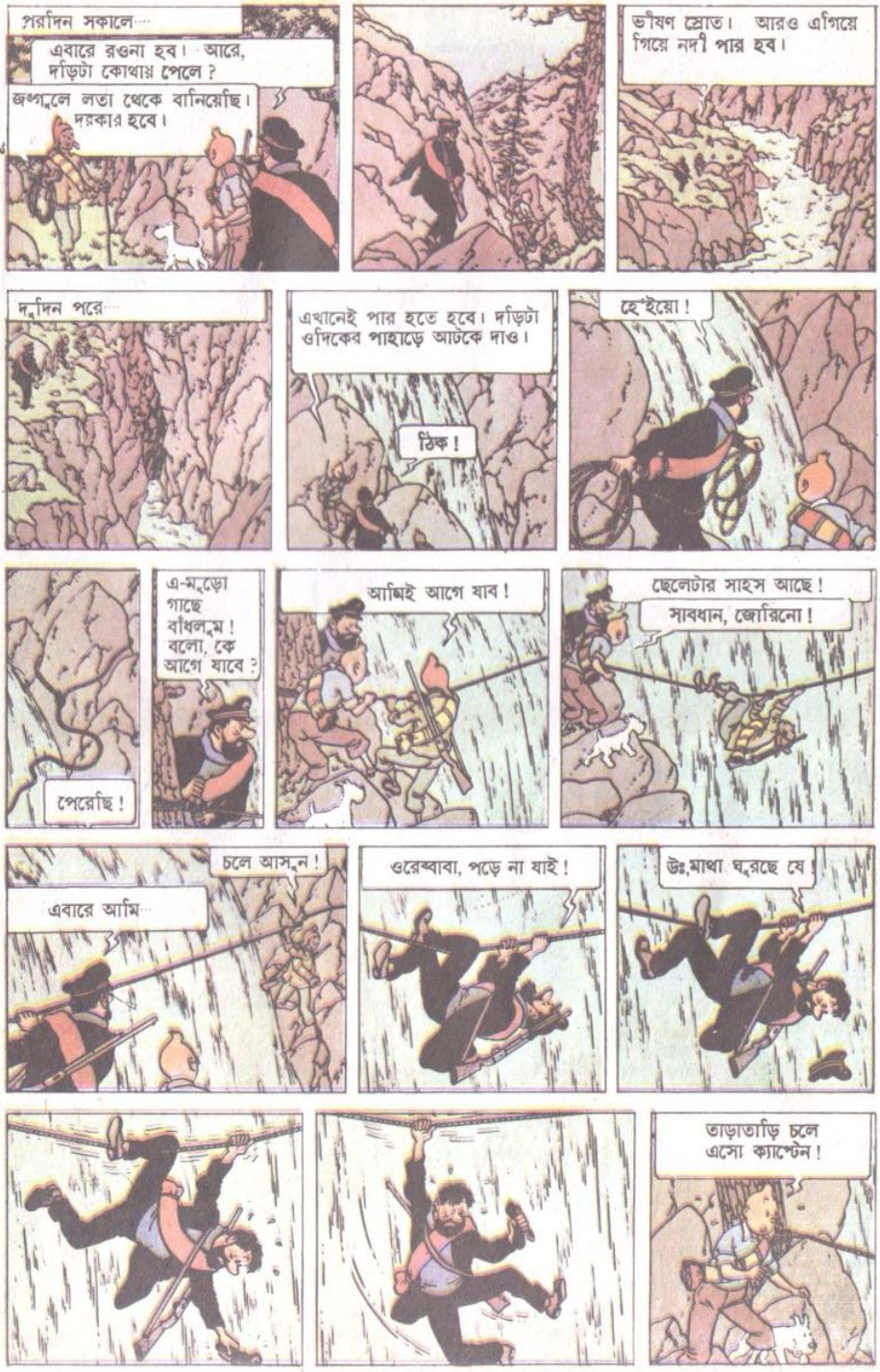
পরদিন সকালে····
এবারে রওনা হব। আরে, দড়িটা কোথায় পেলে?
জঙ্গলে লতা থেকে বানিয়েছি। দরকার হবে।
ভীষণ স্রোত। আরও এগিয়ে গিয়ে নদী পার হব।
দুদিন পরে····
এখানেই পার হতে হবে। দড়িটা ওদিকের পাহাড়ে আটকে দাও।
ঠিক!
হেঁইয়ো!
পেরেছি!
এ-মুড়ো গাছে বাঁধলুম! বলো, কে আগে যাবে?
আমিই আগে যাব!
ছেলেটার সাহস আছে!
সাবধান, জোরিনো!
চলে আসুন!
এবারে আমি····
ওরেব্বাবা, পড়ে না যাই!
উঃ,মাথা ঘুরছে যে!
তাড়াতাড়ি চলে এসো ক্যাপ্টেন!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আগে যা ঘটেছে : রুকু-সুকু দুই ভাই। ডালটনগঞ্জে থাকে। কুকুরের নাম আলবার্ট, বেড়ালের নাম শেলি। দুই ভাইয়ে যেমন ঝগড়া, তেমনি ভাব। বাবা ডাক্তার। থার্মা থেকে রুকু-সুকুর দাদামশাই অনেক উপহার নিয়ে এসেছেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে দাদামশাইয়ের এক বন্ধু—মেজর কালী মুখার্জি—ডালটনগঞ্জে এসে হাজির। দাদামশায়কে সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরের সন্ধানে আফ্রিকায় যেতে চান। তারপর....

॥ ৯ ॥

বেশ কয়েকদিন হল রেবেকা স্কুলে আসছে না। রেবেকা না এলে ক্লাসটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। এত চেষ্টা করেও সুকু রেবেকার জন্যে একটা কাঠবেড়ালি ধরতে পারেনি। বাগানের কোণে কাঠি দিয়ে ধামা উঁচু করে তলায় চিনেবাদাম ছড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে, কাঠবেড়ালি পাশ দিয়ে চলে গেছে, ধামার বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে ছড়ানো চিনেবাদাম তাকিয়ে দেখেছে, কিন্তু ফাঁদে পা দেয়নি। সেদিন সুকুদের বাড়িতে একটা লোক ধামা, চুবড়ি, কুলো বেচতে এসেছিল, তার কাঁধে বসে ছিল একটা বেজি। গলায় একটা সরু দড়ি বাঁধা। সুকু জিজ্ঞেস করেছিল, "কী করে ধরলে গো?" লোকটা বলেছিল, "আপুনা থেকে হামার কাছে আসিয়ে গেল।" তার মানে ওর মনে হিংসেটিংসে ছিল না। সাধুর মতো মানুষ। দু'ভাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। সুকু জিজ্ঞেস করল, "দাদা, আমার হিংসেটা একটু কমেছে রে?"

রুকু ভেবে বলল, "মনে হয় সামান্য কমেছে। তোর কোনও জিনিসে হাত দিলে আগের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক করিস না।"

"তা করি না ঠিকই, তবে মনে ভীষণ কষ্ট হয়, চেপে থাকি। এই যেমন আমার গন্ধঅলা ভাল ইরেজারটা তোর ব্যাগে। তুই যতবার কাগজে ঘষবি আমার বুকটা কেমন করে উঠবে।"

"তা হলে নিয়ে নে।"

"না না, তোর কাছে রাখ, আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে কাগজে ঘষ। মাঝে-মাঝে দাঁত দিয়ে কামড়া। কালকে আমার সবচেয়ে ভাল কলমটা তোকে দিয়ে দোব। দাদা, তুই বাড়ি যা, আমি একবার রেবেকার খবর নিয়ে আসি।"

"সে তো অনেক দূরে রে। তোর তা হলে ফিরতে দেরি হবে।"

"মাকে একটু বুঝিয়ে বলিস দাদা।"

রুকু ঘাড় নেড়ে মন খারাপ করে চলে গেল। সুকুটা বাড়িতে না থাকলে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। আজ দু'জনেরই টার্মিন্যাল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। দু'জনেই প্রথম হয়েছে। একটা টাঙ্গা গেল তরিতরকারি বোঝাই। চার্চে যাচ্ছে। রাঁচির টাটকা কপি, এক ঝুড়ি লাল টোম্যাটো, বীনস। টাটকা সবজি দেখলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। একটা গাজর রাস্তায় ছিটকে পড়ল। রুকু তুলে নিয়ে প্যান্টের পেছনে ভাল করে মুছে খেতে খেতে বাড়িমুখো হল।

রেবেকাদের বাড়িটা বাজারের দিকে। সিনেমা-হলের পাশ দিয়ে যেতে হয়। হলের সামনে ব্যান্ড বাজছে। বাইরে রঙিন পোস্টার হরারস অব ড্রাকুলা। একটা বীভৎস মুখ, এত বড়-বড় দাঁত। ছবিটা মোটেই ভাল লাগল না। পাশেই চিনেবাদাম বিক্রি হচ্ছে।

রেবেকার জন্যে একটা কিছু কিনলে হয়। পকেটে কিছু পয়সাও আছে। একটা স্টেশনারি দোকান থেকে সুকু কিছু চকোলেট কিনল। চকচকে রাংতা মোড়া। রেবেকাদের বাড়িটা ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাজানো বাগান। সাদা রং করা কাঠের গেট। সুকু বারান্দায় উঠে ডাকল, "রেবেকা রেবেকা।" কোনও সাড়া নেই। আবার ডাকল, "রেবেকা।"

রেবেকাদের আয়া বেরিয়ে এসে বলল, "রেবেকার খুব অসুখ।"

"কোথায় সে?"

"শুয়ে আছে।"

সুকু শোবার ঘরে এসে দেখল, রেবেকা কপালে হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে আছে। ঘরটা অন্ধকার-অন্ধকার।

"রেবেকা।"

হাত সরিয়ে রেবেকা তাকাল, "সুকু, আমার জ্বর হয়েছে।"

সুকু কপালে ঠান্ডা হাত রাখল। বেশ গরম। "তোমার বাবা কোথায়?"

"বাবা রাঁচি গেছেন।"

রেবেকার বাবা রেলে চাকরি করেন। সুকু বলল, "কবে আসবেন? তোমার জ্বর দেখে গেছেন।"

"না, বাবা যেদিন গেলেন, সেদিন বিকেলে জ্বর এল। তিন দিন পরে ফিরবেন।"

"বাড়িতে তুমি একলা আর তোমাদের আয়া?"

"হ্যাঁ, আর কে থাকবে বলো?"

"ওষুধ খেয়েছ?"

"হ্যাঁ, ফাদার রুপার্ট এসেছিলেন।"

"তুমি আমাদের বাড়িতে চলো।"

"না সুকু। আমি বেশ আছি। আমার কে আছে বলো। একলাই তো আমাকে থাকতে হবে।"

"তার মানে? আমি আছি, আমার দাদা, মা বাবা দাদু আর এক দাদু আছেন। চলো শিগগির। বাবার ওষুধ খেলে সব সেরে যাবে।"

"না সুকু। আমার বাবা রাগ করবেন।"

"তোমার বাবাকে, আমার বাবা বলবেন। নতুন যে দাদু এসেছেন, তিনি সাংঘাতিক মানুষ। তোমার খুব মজা লাগবে।"

"না সুকু, তোমার মা রাগ করবেন।"

"আমার মা? আমার মাকে তুমি চেনো না। চলো তুমি।"

"না সুকু।"

"আবার না? দেখবে তা হলে?" টেবিলের ওপর একটা দেশলাই পড়ে ছিল। সুকু দেশলাইটা তুলে নিয়ে একটা কাঠি জ্বালাল খচাত করে। "এই আগুনে আমার হাতের প্রত্যেকটা আঙুল পোড়াতে থাকব।"

রেবেকা ধড়মড় করে উঠে বসল. "না সুকু, না, লক্ষ্মীটি না। তুমি বুঝে দ্যাখো. আমি গেলে বাড়ি কে দেখবে?"

"তোমাদের আয়া দেখবে। আমাকে যাতা বোঝাতে এসো না।"

সুকু আর-একটা কাঠি জ্বালাল, "হ্যাঁ কি না. বলো হ্যাঁ কি না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাব।"

সুকু দেশলাইটা ফেলে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল একটা টাঙ্গা চলেছে। দু'জনে দুলতে দুলতে চলেছে। সন্ধ্যা নামছে বেশ জাঁকজমক করে, চারপাশ

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"

ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক

GD

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০ ০৫৩

HTC-GDP-3760

গাড়া হয়ে উঠেছে।

সুকু ডাকল, "রেবেকা।"

"উঁ।"

"কষ্ট হচ্ছে।"

"না তো।"

"আজ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে জানো? তুমি সেকেন্ড হয়েছ। আমি ফার্স্ট। তুমি এগ্রিগেটে আমার চেয়ে মাত্র পনেরো নম্বর কম পেয়েছ।"

কোথায় যেন দুটো পাখি টুইট টুইট করে ডাকল। সুকুর মনে পড়ল, দাদু বাইনোকিউলার দিয়েছেন। বাবা দিয়েছেন পাখির বই। কাল সকাল থেকেই পাখি চিনতে বেরোতে হবে।

টাঙ্গাটা বাড়ির কাছাকাছি এসেছে। সুকু দূর থেকেই দেখছে কে একজন ছুটছেন। এইভাবে ছোটাকে বলে জগিং। এ আর কেউ নয়, মেজর মুখার্জি। সুকুদের টাঙ্গা বাঙলোর সামনে পৌঁছনোর আগেই মেজর মুখার্জি গেটের সামনে পৌঁছে গেছেন। তখনও আশ মেটেনি। ধীরে ধীরে লাফাচ্ছেন। সুকু বললে, "রেবেকা, চোখ চেয়ে দ্যাখো ওই আমার ছোট দাদু।"

রেবেকা জ্বরের ঘোরে ভাল করে তাকাতে পারছে না। তবু একবার চাইল।

টাঙ্গাটা থামতেই মেজর বললেন, "আরে সুকু যে, তুমি তো আচ্ছা ছেলে। কোথায় থাকো সারাদিন! তোমার জন্যে এমন বিকেলটা আজ মাটি হয়ে গেল।"

"কী করব ছোট দাদু? রেবেকাকে দেখতে গিয়েছিলুম। এই দেখুন না নিয়ে এসেছি। ভীষণ জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে।"

"তাই নাকি? এখানেও জ্বর হয়? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি কোলে করে নামাই।"

মেজর পাঁজাকোলা করে রেবেকাকে টাঙ্গা থেকে তুলে নিলেন। সুকু লাফিয়ে নামল। রাজ্যেশ্বরী বাগানেই পায়চারি করছিলেন। এগিয়ে এলেন গেটের কাছে। উদ্বিগ্ন গলা। "কী হয়েছে রে সুকু?"

"আর বলো কেন মা? জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, এদিকে ওর বাবা চলে গেছেন রাঁচিতে। কেউ দেখার নেই। আসছিল না। জোর করে নিয়ে এলুম। তুমি মা টাঙ্গা - ভাড়াটা দিয়ে দাও।"

মেজরের কোল থেকে নিজের কোলে রেবেকাকে নিয়ে রাজ্যেশ্বরী বললেন, "আমার চশমার খাপে টাকা আছে, তুই দিয়ে দে না বাবা, আমি মেয়েটাকে দেখি।"

রেবেকা রাজ্যেশ্বরীর বুকে মুখ গুঁজে বললে, "মাদার, আই অ্যাম সরি।"

মেজর বললেন, "মেয়ে, গরম জলে নুন ফেলে ফুটবাথ, তারপর কম্বল-চাপা, তারপর ঘাম দিয়ে জ্বরের পলায়ন, তারপর গরম রুটি, ঝালঝাল মাংসের ঝোল।"

রাজ্যেশ্বরী রেবেকাকে নিয়ে ঘরের দিকে এগোলেন। গোটাকতক সাদা গোলাপ তখনও অন্ধকারে হারিয়ে যায়নি। বাতাসে মাথা নাড়ছে। হাসনুহানার ঝোপ থেকে ফুলের তীব্র গন্ধ বলছে, রাত হল, রাত হল।

রাতের দিকে রেবেকার জ্বরটা খুব বাড়ল। ডকটর মুখার্জি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাড়িতে দু দু'জন রোগী। সুধীরঞ্জন একটু সামলেছেন ঠিকই, তবে একেবারে সুস্থ হবেন কি না ঈশ্বরই জানেন। রেবেকা রাজ্যেশ্বরীর ঘরে তাঁরই খাটে শুয়ে আছে। মাঝে-মাঝে ভুল বকছে। কখনও বলছে "আর মেরো না বাবা, ভীষণ লাগছে।" কখনও বলছে, "আমার অঙ্কর খাতাটা কোথায় রাখলে মা?"

রাজ্যেশ্বরীর চোখ ছলছলে, "ফুলের মতো এমন একটা মেয়েকেও লোকে মারে?"

মেজর ভাবছেন, পৃথিবীতে মা জিনিসটা কী অপূর্ব! মায়ের কাছে আপন নেই, পর নেই, সন্তানের কোনও জাত নেই।

সুধী যেমন, সুধীর মেয়েটাও তেমন। মেজর বললেন, "মেয়ে, রেবেকাকে আমার ঘরে দাও, আমার তো সারারাত ঘুম হয় না, জেগেজেগে সেবা করব।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "একটু বরফ পেলে ভাল হত, মাথায় বোধহয় আইসব্যাগ চাপাতে হবে।"

মেজর বললেন, "বরফ? সে তো বাজারে, সিনেমার ধারে পাওয়া যাবে, আমি এনে দিচ্ছি। সাইকেল আছে, ভয় কী?" তিনি সাইকেল নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

সুধীরঞ্জন রুকু আর সুকুকে বললেন, "ভয় নেই, দেখবে কালই জ্বর ছেড়ে যাবে।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি দেবাশিস দেব

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন একটি চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

দাঁতের পুরোপুরি যত্ন নেবার জন্যে
কোলগেট ট্রাইগার্ড টুথব্রাশ ব্যবহার করুন...
এটি দাঁতকে তিন ভাবে সুরক্ষা করে

1. দাঁতের এনামেল সুরক্ষা করে।
2. দাঁত কোনও ময়লা জমতে দেয় না।
3. মাড়ির সুরক্ষা করে।

DC.G.74 BN

॥ ৬ ॥

জামশেদপুর থেকে পাটনা যাবার পথে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হল না। এত তাড়াতাড়ি বিহার ট্রায়ালে ডাক পাব, আমি ভাবিনি, বাবা কিন্তু বারবার বলেছেন, "তোমাকে ডাকবেই।" বাবা যে আমাকে শুধু খেলাধুলোতেই উৎসাহ দিয়েছেন, তা নয়। আমার গান শেখার ব্যবস্থাও করেছিলেন। জলপাইগুড়িতে থাকার সময় রাজবাড়ির ছেলে পরবর্তীকালে বিখ্যাত শিল্পী প্রদ্যোৎনারায়ণের কাছে মাঝে-মাঝে গান শিখতে যেতাম। তবে মন দিয়ে গানবাজনার চর্চা জামশেদপুরেই করেছি। ভজন গেয়ে প্রাইজও পেয়েছি। কিন্তু, লক্ষ্যভেদী অর্জুনের সেই শুধুমাত্র পাখির চোখ দেখার মতো, ফুটবলই শেষ পর্যন্ত আমাকে সম্পূর্ণভাবে টেনে নিল। এখনো অবশ্য মাঝে-মাঝে গুনগুন করে প্রায় নিজের অজান্তেই গান বেরিয়ে আসে। সে আর কার না আসে, বলো!

পাটনায় পেঁছে সবাই দেখা করলাম বি এন কলেজের প্রিন্সিপাল মৈনুল হুক সাহেবের সঙ্গে। তিনিই তখন বিহারের খেলাধুলোর জগতের সর্বেসর্বা। ফুটবল-ক্যাম্পের দায়িত্ব ছিল তাঁর এক সহযোগী মঙ্গলপ্রসাদের উপর। পাটনা সেক্রেটারিয়েটের মাঠে প্র্যাকটিস হত।

চোট থাকায় নিজের খেলায় সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। কিন্তু ট্রায়াল ম্যাচগুলোয় ভাল খেলায় বাঙ্গালোরগামী বিহার টীমে ঢুকে গেলাম। ভেবেছিলাম খবরটা শুনে বাবা খুব উচ্ছ্বসিত হবেন। ভুল ভেবেছি। বাবা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চিঠি লিখে জানালেন, "আমি জানতাম তুমি বিহার টীমে থাকবে। সুযোগ পেলে ভাল খেলার চেষ্টা কোরো।"

সুযোগ অবশ্য পাইনি। বিহারের খেলা পড়ল বোম্বাইয়ের সঙ্গে। বোম্বাই টীমে ছিলেন সঞ্জীব, পরব আর টমাসের মতো ভারতখ্যাত ফুটবলাররা। আমরা ৪—০ গোলে হেরে গেলাম। আমি খেলার সুযোগ পাইনি, কারণ টীমের প্রথম রাইট উইঙ্গার ছিলেন আলি ইমাম। রাঁচির এই অমায়িক ফুটবলারটি পেশায় অ্যাডভোকেট। আমাকে

শৈলেন মান্না (এখন)

মেওয়ালাল (এখন)

খুব স্নেহ করতেন। খেলার সুযোগ না পেয়ে তাই দুঃখিত হবার কোনো কারণ ছিল না।

খেলার সুযোগ পাইনি বটে, কিন্তু দু' চোখ ভরে সেই সব ফুটবলারদের খেলা দেখলাম—যাঁরা আমার স্বপ্নের মানুষ। শৈলেন মান্না, বেঙ্কটেশ, মেওয়ালাল, রামন—এঁদের খেলা দেখতে-দেখতে ভাবলাম, কখনো কি এঁদের কাছাকাছি ফুটবলার হতে পারব? আসলে, সেই ইচ্ছা আর হওয়াটা ধীরে-ধীরে মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, যা একজনকে বড় করে। দেখলাম, ফুটবল কত সমৎকারভাবে খেলা যায়। কত কিছু শেখার আছে। পাটনা থেকে বাঙ্গালোর ট্রেনে খুব কষ্ট করে আসতে হয়েছিল। আমার স্বপ্নের ফুটবলারদের খেলা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, ট্রেন-জার্নির কষ্ট তো তুচ্ছ, এমন খেলা দেখার জন্য কয়েক শো মাইল হেঁটে আসা যায়।

তখন অবশ্য বাঙ্গালোর এখনকার মতো সাজানো-গোছানো শহর ছিল না। আমরা উঠেছিলাম ছোট্ট একটা হোটেলে। বিহারের ছেলে নির্মল চক্রবর্তী ওড়িশার হয়ে চমৎকার খেলায় আমরা বেশ গর্ব অনুভব করলাম। ওড়িশা সেবার সেমি ফাইনালে উঠেছিল।

বাঙ্গালোর থেকে পাটনায় ফিরে নিজেই বুঝলাম, আমার মধ্যে সত্যিই কিছু পরিবর্তন এসে গেছে। বড় হতে হবে—এই হাওয়াটা তখন প্রায় ঝড়ের রূপ নিয়েছে। বলতে পারো, এই সময় থেকেই, নিজেকে প্রায় পুরোপুরি ফুটবলের মধ্যে মিশিয়ে দিলাম।

তবে পুরোপুরি নয়। কারণ সেই সময়েই অ্যাথলেটিকসের জন্য টেলকোয় আমার চাকরি হয়ে গেল। টেলকো কর্মীর সন্তান হিসেবে টেলকো স্পোর্টসে নামার সুযোগ পেয়েছিলাম। টেলকোয় রনি ওব্রায়েন আর পিটার ওব্রায়েনের মতো নামী অ্যাথলীটরা জ্বলজ্বল করছেন। বছর দেড়েক বাদে ম্যানিলা এশিয়ান গেমসে ব্রোনজ মেডেল পেয়েছিলেন রনি ওব্রায়েন। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় একশো মিটার দৌড়ে তৃতীয় হয়েছিলেন পিটার ওব্রায়েন। এই দুজন ছাড়াও আরো কয়েকজন নামী

শুধু তোমাদের জন্য

তোমরা যারা 'সি, এম, ডি, এ কি কি করে' এ বিষয়ে লেখা ও আঁকা পাঠিয়েছো তাদের সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের সহযোগিতার জন্য।

কলকাতা শহরটা শুধু যে বড়দের একার নয়, তোমরাও যে এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা কর, চোখ-কান খুলে রাস্তায় হাঁটা চলা কর সেটাই তোমাদের পাঠানো আঁকা ও লেখা থেকে বোঝা গেল। একটা কথা ঃ তোমাদের সকলের লেখা ও আঁকা ভাল হয়েছে। তোমরা যে আগ্রহ নিয়ে, কলকাতাকে ভালবেসে এত যত্ন করে ওগুলো পাঠিয়েছো সেটাই বড় কথা। জায়গার অভাবে সকলের ছবি ও লেখা ছাপানো সম্ভব নয়। যারটা ছাপানো হচ্ছে এবং যারা যারা পাঠিয়েছো প্রত্যেককে আমরা তোমাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শীগগীরই যে লেখা ও আঁকা দুটি সবচেয়ে ভাল হয়েছে সে দুটি প্রকাশিত হবে।

আর একটা কথাঃ প্রশ্নটা ছিল "সি, এম, ডি,এ-র কাজকর্ম" মেট্রো রেল নয়, কারণ পাতাল রেল সি, এম, ডি,এ-র প্রকল্প নয়।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অক্‌ল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

অ্যাথলীট আসরে থাকায়, বাবাও আশা করেননি, আমি তেমন কিছু করে উঠতে পারব।

একশো মিটার দৌড়ে ডেনিস ওব্রায়েন যথারীতি ফার্স্ট হলেন, আমি থার্ড। দ্বিতীয় দিনে দুশো মিটারের ফাইনাল। আমি বাবাকে বললাম, "দুশো মিটারে আমি ডেনিস ওব্রায়েনকে হারাবই।" বাবা কিন্তু খুব বকলেন। আমার কথাবার্তায় কোনোরকম ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কারের গন্ধ পেলেই তিনি বকতেন। কিন্তু দুশো মিটারে সত্যিই ডেনিস ওব্রায়েনকে হারিয়ে দিলাম। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডেনিস ওব্রায়েন আমাকে তাচ্ছিল্যই করতেন। কিন্তু তিনি যে মানুষ হিসেবে কত বড় মাপের, তা কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম। টেলকো স্পোর্টসে মিডলে রিলেতে বাইরের প্রতিযোগীরাও যোগ দিতেন। মিডলে রিলের প্রথম দুশো মিটার টেলকোর হয়ে দৌড়তেন ডেনিস ওব্রায়েন। তাঁর কাছ থেকে টীম অন্তত পাঁচ মিটারের লীড পেয়ে যেত। ঐ স্পোর্টসের দ্বিতীয় দিনই স্টোর্স ক্লার্কের চাকরিতে বহাল হয়ে গেছি। সুতরাং টেলকোর মিডলে রিলে টীমে (২০০ মিঃ +৪০০ মিঃ+৮০০... মিঃ+২০০... মিঃ) থাকার সম্ভাবনা ছিল। তবু এতটা আশা করিনি। ডেনিস ওব্রায়েন স্বয়ং এসে বললেন, "ব্যানার্জি. উইল স্টার্ট!" নিজের অভ্যস্ত জায়গা ছেড়ে দিয়ে তিনি শেষ দুশো মিটার দৌড়নোর দায়িত্ব নিলেন। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। প্রাণপণে ছুটে টীমকে প্রায় পাঁচ মিটার লীড দিলাম। শেষ দুশো মিটারে ব্যাবধানটাকে প্রায় পনেরো মিটারে নিয়ে গেলেন ডেনিস ওব্রায়েন।

এরপরেই বোম্বাইয়ে সর্বভারতীয় টাটা স্পোর্টস। সেখানেই দেখলাম ভারতের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বল্পপাল্লার দৌড়বীর লেভি পিন্টোকে। তবে সবচেয়ে বড় চমক এল স্বয়ং জে আর ডি টাটার কাছ থেকে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর রাত্রে এক অনুষ্ঠানে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। ঐ অল ইন্ডিয়া টাটা স্পোর্টসে রিলে ছাড়া অন্য কোনো ইভেন্টে প্রাইজ পাইনি, তবু তিনি ডাকায় কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, "শুনলাম তুমি বিহার স্টেট ফুটবল টীমেও আছ। স্পোর্টস অফিসারকে বলে দিয়েছি, কথা বলতে পারো। বোম্বের হেড অফিসে আসতে রাজি কি না ভেবে দ্যাখো।"

স্পোর্টস অফিসার বললেন, "আমি কালই জামশেদপুরে চিঠি লিখে দিচ্ছি। পাঁচশো টাকা মাইনে পাবে, তুমি আসতে রাজি তো?" টেলকোতেই চাকরি করলেও জামশেদপুরে স্টোর ক্লার্ক হিসেবে আমি পেতাম মাসে সাকুল্যে পৌনে দুশো টাকা। এক লাফে পাঁচশো টাকায় ওঠার ভাবনাটা আমাকে জোর ধাক্কা দিল বইকী! তবু আমি বললাম, "আমি তো কিছু বলতে পারব না। বাবা যা বলবেন, তাই করব। তিনিও টেলকোয় চাকরি করেন।"

বাবার সঙ্গে সেইদিনই যোগাযোগ করা হল। তিনি অতি সংক্ষিপ্ত জবাবে জানিয়ে দিলেন, "না।" আমি পাঁচশো টাকা মাইনে পেলে সংসারের খুব উপকার হত সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবা জানতেন, বোম্বাইয়ে একা থাকলে আর যাই হই, বড় ফুটবলার হতে পারব না। তখন বেশি ভেবে দেখিনি, কিন্তু এখন বুঝি যে, বাবার ঐ সিদ্ধান্তটা কতখানি নিঃস্বার্থ এবং নির্ভুল ছিল। (ক্রমশ)

১৯৩১ সাল। গান্ধীজি লন্ডনে গেছেন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর অবিসংবাদী নেতাকে এ-রকম পোশাকে দেখবে বলে কেউ ভাবতেই পারেনি। একটা খাটো ধুতি পরনে, গায়ে একটা চাদর। রানীর সঙ্গে কথা বলছেন গান্ধীজি, রানী বললেন, "এত অল্প পোশাকে আপনার চলে কী করে, ভাবতে আমার অবাক লাগে।" দুজন সহচরের তুলে ধরা রাজার অঙ্গে ঝকমকে স্কন্ধবাস দেখিয়ে সহাস্যে উত্তর দিলেন গান্ধীজি, "আমার পোশাকের ঘাটতিটুকু মহারাজ কিন্তু পুষিয়ে দিয়েছেন।"

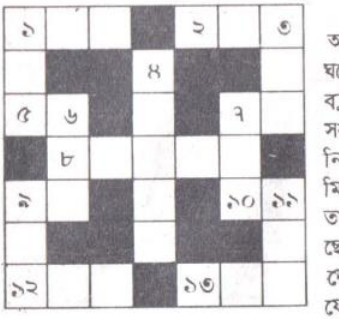

সংকেত : পাশাপাশি : (১) মহাভারতের মহাবীর। (২) যে-সব ভাষা থেকে বাংলায় প্রচুর শব্দ এসেছে তাদের একটি।(৫) পার্বত্য জাতিবিশেষ। (৭) যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম। (৮) নদীর নামে পতঙ্গ। (৯) শত্রু। (১০) বন্ধু। (১২) বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা উপন্যাস। (১৩) যুদ্ধ।

উপর-নীচ : (১) মৎস্য-শিকারির নয়নের মণি (৩) পাখি-ধরার ফাঁদ। (৪) নক্ষত্রবিশেষ। (৬) কলসি। (৭) পৌরাণিক চরিত্র হলেই যে-ধাতু কুখ্যাত হয়। (৯) নবজাত উদ্ভিদ। (১১) বিখ্যাত পৌরাণিক অরণ্য।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ভূ	গু		প্র		ক	শা
ঙ্গা		জ্যো	তি	ষ্ক		নি
র	ফা		হা		হি	ত
	হি		রী		ম	
না	য়ে	গ্রা		মে	বা	র
স	ন		শে		হ	বি
ত্য		ত	র	ণি		ন

ছোটকার ঘরে পুজোর আনন্দমেলাটা পেলাম। ছোটকা ঘরে নেই। প্রথমেই একবার চোখ বুলিয়ে নিই ধাঁধাগুলোর ওপরে। সবই এবার সত্যি আর মিথ্যে নিয়ে। নামও সেইজন্যেই 'সত্যি-মিথ্যের ধাঁধা'। উত্তর করা হল না, তার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ল ছোটকা। আমার হাতে আনন্দমেলা দেখে দূর থেকেই প্রায় গোয়েন্দা ফেলুদার কায়দায় ছোটকা বলে উঠল, "সত্যি-মিথ্যের ধাঁধার উত্তর করলে সতুবাবু? পেরেছ একটাও?"

আমি বললাম, "কী করে বুঝলে, আমি ধাঁধাই পড়ছিলাম?"

জবাবে ছোটকা হেসে বলল "প্রথমত, তোমার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে। দ্বিতীয়ত খোলা পাতার পরিসর আন্দাজ করে। তুমি যে প্রথমে ধাঁধা দেখতে আগ্রহ বোধ করবে এটা স্বাভাবিক, আর যেহেতু ধাঁধাগুলো আমারও দেখা, বইটার কোন্ জায়গায় ধাঁধাগুলো রয়েছে তার একটা আন্দাজও রয়েছে, সুতরাং দূর থেকেই বুঝতে পারলাম, বইয়ের যে-জায়গাটা খুলে তুমি পড়ছ, সেখানে ধাঁধা থাকারই সম্ভাবনা বেশি।"

আমি আর কী উত্তর দেব, চুপ করে থাকি, কোনো ভুলই হয়নি ছোটকার। ছোটকা তখন বলল, "এবার আমিও তোমায় একটা সত্যি-মিথ্যের ধাঁধা দেব। লিখে ফেলো চটপট।"

আমি লিখে ফেললাম, তক্ষুনি।

প্রথম ধাঁধা ॥ এক দ্বীপে দু-ধরনের লোক থাকে। গুহাবাসী আর বৃক্ষবাসী। গুহাবাসীরা সব সময় বলে মিথ্যে কথা, আর বৃক্ষবাসীরা সবসময় সত্যি কথা বলে।

ধরো, তুমি গিয়েছ সেই দ্বীপে। তুমি দেখলে দ্বীপের একজন অধিবাসী তোমার দিকে আসছে। তুমি জানো না, সে বৃক্ষবাসী না গুহাবাসী। চেহারা দেখে কিছু আন্দাজ করা যাচ্ছে না। যায়ও না।

তুমি তাকে, একটিমাত্র প্রশ্ন করে কীভাবে জেনে নিতে পারো, সে গুহাবাসী না বৃক্ষবাসী?

মনে রাখবে, একটিমাত্রই প্রশ্ন করতে পারবে তুমি। আর তার উত্তর থেকেই আঁচ করতে হবে লোকটি গুহাবাসী না বৃক্ষবাসী।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একজনকে বয়স কত জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিলেন, 'তিন বছর পরে আমার যা বয়স হবে, তাকে তিন দিয়ে গুণ করে তার থেকে তিন বছর আগে আমার যা বয়স ছিল তার তিন গুণ বিয়োগ করলে, আমার এখনকার বয়েস পাওয়া যাবে। আর এমনি খোঁজ করলে খোঁজো সুকান্ত ভট্টাচার্যর কবিতায়।' ভদ্রলোকের কত বয়েস বলতে পারো?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ শব্দটার জট ছাড়াও—

মরোজচানা

চতুর্থ ধাঁধা ॥ কোন্‌টা বেমানান?

বাবা; কাকা; দাদা; মা; ছেলে

গতবারের উত্তর ॥ (১) সাতটি ডিম। (২) হিং টিং ছট। (৩) মকরবাহিনী। (৪) ৫০।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

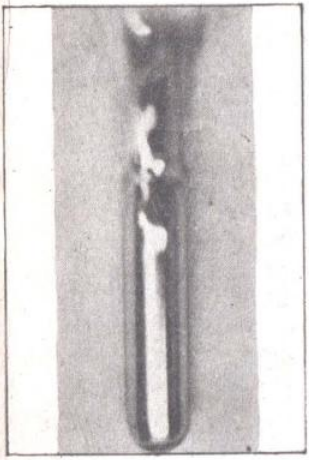

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল স্ক্রু-র ফোটো
ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ প্ল্যানচেটে এক বন্ধুর আত্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বলছ তো খুব ফুর্তিতে আছ, তা স্বর্গে কোন্ মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হল?" আত্মা কী উত্তর দিল আন্দাজ করতে পারেন?

উঃ নিশ্চয়ই পারি। সে বলল, "কে বললে আমি স্বর্গে আছি?"

প্রঃ দশ টাকা ধার চাইছ হঠাৎ আসানসোলে যেতে হচ্ছে বলে, কবে ফিরবে, কবে টাকাটা ফেরত দেবে, সে-সব তো কিছু বলবে?

উঃ আজ্ঞে যাচ্ছেটা কে?

প্রঃ আমার নতুন ড্রাইভারটি মনে হচ্ছে রং-কানা, ট্র্যাফিক লাইটের লাল-হলুদ-সবুজ সব গুলিয়ে ফেলছে, কী করা যায় বলুন তো?

উঃ একখণ্ড বর্ণ-পরিচয় কিনে দিন।

সুসেন

মজার খেলা

এ-খেলার জন্য চাই তিরিশটা দেশলাইকাঠি আর একজন বন্ধু।

খেলার নিয়মটা প্রথমে জেনে নাও। তুমি এক দানে ইচ্ছেমতো ১ থেকে ৩ সংখ্যক কাঠি তুলবে, পালটা দানে তুলবে তোমার বন্ধু। খেলার শুরুতে টেবিলে থাকছে তিরিশটা কাঠি। তুমি এর থেকে এক দানে একটা বা দুটো বা তিনটে কাঠি তুলে সরিয়ে রাখবে, পালটা দানে তোমায় বন্ধুও সেই রকমই কাঠি সরাবে। শেষ কাঠিটা যাকে সরাতে হবে সে যাবে হেরে। মনে রাখবে এক-এক দানে একজন খেলোয়াড়কে অন্তত একটা কাঠি তুলতেই হবে, ইচ্ছে করলে দুটো বা তিনটেও সে তুলতে পারে, তবে তিনের বেশি নয়।

এ-খেলাটা আন্দাজে খেলে গেলে কখনো তুমি জিতবে, কখনো তোমার বন্ধু। কিন্তু প্রথম থেকে যদি তুমি একটু হিসেব করে খেলো, সব সময়ই তুমি জিতবে।

কীভাবে? তাহলে তোমাকে প্রত্যেক দানেই হিসেব করে কাঠি

তুলতে হবে। সেই হিসেবটা হল, তুমি যখনই কাঠি তুলবে দেখতে হবে টেবিলে যেন ২৯, ২৫, ২১, ১৭, ১৩, ৯, ৫, ১ এই সংখ্যক কাঠি এক-এক দানের পর পড়ে থাকে। অর্থাৎ প্রথম দান তোমার হলে তুমি ১টা কাঠি তোলো, টেবিলে ২৯টা কাঠি রইল। পরের দানে বন্ধু যা-ই তুলুক, তুমি সেই আন্দাজে এমন কাঠি তুলবে যাতে ২৫টা পড়ে থাকে। এইভাবে প্রত্যেক দানে ওপরে-বলা সংখ্যা অনুসারে কাঠি রেখে যাও টেবিলে। দেখবে শেষ কাঠিটা সব সময়ই বন্ধুকে তুলতে হচ্ছে এবং সে হেরে যাচ্ছে।

মজারু

হাসিখুশি

মিহিরবাবু এবং সুধাঙ্কুরবাবু দুজনে কলকাতার একই অফিসে কাজ করেন থাকেন হালিশহরে প্রায় একই অঞ্চলে। রোজ তাঁরা সকাল আটটা পঁচিশের ট্রেন ধরেন। একদিন ঐ ট্রেন ধরবার জন্য দুজনে খুব দৌড়চ্ছেন। হঠাৎ সুধাঙ্কুরবাবু বললেন, "আপনার ঘড়িতে কটা বাজে?"

মিহিরবাবু বললেন, "আটটা পনের।"

সুধাঙ্কুরবাবু বললেন, "তাহলে আপনি দৌড়োন, ট্রেনটা পেয়েও যেতে পারেন, কিন্তু আমার আর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।"

মিহিরবাবু বললেন, "কেন আপনার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই কেন?"

সুধাঙ্কুরবাবু বললেন, "কারণ আমার ঘড়িতে এখন আটটা বেজে তেইশ মিনিট। দু মিনিটে অতটা পথ দৌড়ুতে পারব না।"

ঘরের ভেতর ঠুকঠুক আওয়াজ শুনে দাদা দৌড়ে এলেন। এসে যা দেখলেন, তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। রিঙ্কু দাদার জমানো গ্রামোফোনের পুরনো রেকর্ডগুলো হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে ভাঙছে। দাদা বললেন, "রিঙ্কু, এ কী করছিস তুই, এগুলো ভাঙছিস কেন?"

রিঙ্কু বলল, "বা রে, ভাঙব না কেন। তুমি সেদিন বলছিলে না, কোন্ এক টেনিস খেলোয়াড় তার আগের রেকর্ড ভেঙে বিস্তর টাকা পেয়েছিল।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

কে?

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে : জয়রামবাবুর ছেলেকে চুরি করেছেন চন্দ্রভানু। কিন্তু ট্রেন-যাত্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। অন্য একটি ছেলেকে জ্যোতি ভেবে গ্রহণ করেন জয়রাম। স্মৃতিভ্রষ্ট আসল-জ্যোতি চান্দৌলির দোকানি চৌবেজির ঘরে ঠাঁই পায়; পরে স্থানীয় ধনী সূর্যনারায়ণের কাছে। তার নাম হয় দেবদত্ত, ওরফে দেবু। সূর্যনারায়ণ জয়রামের বন্ধু; কিন্তু দেবুই যে জয়রামের নিখোঁজ ছেলে, সূর্য তা জানেন না। ওদিকে নকল-জ্যোতিকেও চন্দ্রভানু চুরি করেন। গাড়ি চালাতে গিয়ে সে দুর্ঘটনা ঘটায়। তার পা কেটে বাদ দিতে হবে। দেবু ইতিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘর ছেড়েছে, তারাও এখন কলকাতায়। অনুতপ্ত চন্দ্রভানু নকল-জ্যোতিকে জয়রামের কাছে কাছে ফিরিয়ে দেন। আসলে তিনি জয়রামেরই ছোট ভাই। নকল-জ্যোতিকে দেখে সূর্য বলেন, এই তো দেবু। তারপর সন্ন্যাসীর ডেরায় গিয়ে দেবুকে দেখে সবাই ধাঁধায় পড়ে যান। নকল-জ্যোতির জখম পা ভাল করে দেবার জন্য সন্ন্যাসী আসেন জয়রামের বাড়িতে। এদিকে বৌবাজারের এক বুড়ি বলছে, সে ছিল এক নার্সিং হোমের নার্স। সেখানে জয়রামের স্ত্রী নীহারকণার একটি নয়, দুটি ছেলে হয়েছিল। তারপর ....

॥৩১॥

চারুবালা দাসীর কথা বলতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। যেটুকু কথা বলেছিল তাতেই হাঁফাচ্ছিল। বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা ছিল না। অন্ধকারে গুমোটে সকলের দম আটকে আসছিল।

চারুবালা দাসী আবার বলে উঠল, "আপনাদের মধ্যে জয়রাম চট্টোপাধ্যায় কার নাম?"

জয়রাম চট্টোপাধ্যায় সামনে এগিয়ে গেলেন। বললেন, "আমার নাম জয়রাম চট্টোপাধ্যায়।"

চারুবালা দাসী বললে, "আজ থেকে বারো বছর আগে আপনি আমাকে দেখেছেন, এখন আপনি আর আমাকে চিনতে পারবেন না, আমারও চোখে ছানি পড়েছে, আমিও আর আপনাকে চিনতে পারব না। কিন্তু বিনোদিনী নার্সিং হোমের নাম আপনার নিশ্চয় মনে আছে। যেখানে আপনি আপনার স্ত্রীকে ভর্তি করিয়েছিলেন। সেখানকার মালিক ছিলেন ডাক্তার দয়াসুন্দর বসু।"

জয়রামবাবু বললেন, "হ্যাঁ, খুব মনে আছে। খুব ভাল ডাক্তার ছিলেন তিনি। কিন্তু আমার যে যমজ সন্তান হয়েছিল তা তো তিনি আমাকে জানাননি।"

চারুবালা দাসী বললে, "তা না-জানাবার কারণ আছে। সেই কারণটাই আমি আজ আপনাকে বলব। আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। হয়তো আজ রাত্তিরেই মারা যেতে পারি। এই যে আমি এখন আপনার সঙ্গে কথা বলছি এতেই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কথাগুলো না বললে আমি মুক্তি পাব না। আপনার স্ত্রী শ্রীমতী নীহারকণা চট্টোপাধ্যায়ের সেই সন্তান হওয়ার পরেই তিনি মারা যান। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ডাক্তার বোস বাঁচাতে পারেননি। ডাক্তার বোস খুব নাম-করা ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু তাঁর টাকার লোভ ছিল খুব। টাকার জন্যে তিনি সব কিছু করতে পারতেন। আপনি তো জানেন আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আপনি কী রকম ভেঙে পড়েছিলেন—"

জয়রাম চট্টোপাধ্যায় বললেন, "হ্যাঁ, আমি যখন সকালবেলা প্রথম আমার স্ত্রীর মারা যাওয়ার খবর পেলাম তখন খবরটা পেয়েই আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। আমি সেই নার্সিং-হোমের মেঝের ওপরেই পড়ে গিয়েছিলুম। আমার আর জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হল তিন দিন পরে একটা হাসপাতালে। ডাক্তার বোস আমাকে অন্য একটা হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলেন। আমার অজান্তেই আমার স্ত্রীকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করা হয়েছিল। আমি তাঁর অগ্নি-সৎকার পর্যন্ত দেখতে পাইনি। আমি প্রথম চোখ খুলেই দেখলাম ডাক্তার বোস আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। প্রথমে তিনি আমাকে খবরটা দেননি।"

সেই দিনের কথা জয়রামবাবু যেমন ঘটেছিল তেমনিই বলে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল সেই সব দিনের কথা।

মনে আছে ডাক্তার বোস জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেমন আছেন এখন?"

জয়রামবাবু বলেছিলেন, "আমি এখানে কী করে এলুম তাই বলুন আগে।"

ডাক্তার বোস বলেছিলেন, "আপনার স্ত্রী মারা যাওয়ার খবর শুনেই আপনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন।"

"আমাকে এখানে কে নিয়ে এল?"

ডাক্তার বোস বললেন, "আমি।"

"কিন্তু আমার স্ত্রী?"

"তাঁকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করা হয়েছে। সৎকারের সব নিয়ম-কানুন পালন করা হয়েছে।"

"কিন্তু আমার সন্তান? সে কি বেঁচে আছে?"

ডাক্তার দয়াসুন্দর বোস বললেন, "হ্যাঁ, আপনার একটি ছেলে হয়েছে, আর সে ছেলেটি এখনও বেঁচে আছে। তার জন্যে বিশেষ নার্স রাখা হয়েছে। সেই সন্তানের জন্যেও আপনার বাঁচা একান্ত দরকার।"

খবরটা সেই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়েই পেয়েছিলেন জয়রামবাবু। কিন্তু বেশিদিন তাঁকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়নি। তিনি যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে এলেন তখন তিনি অনেক দুর্বল হয়ে গেছেন। তাঁর ছেলেকেও একদিন নার্সিং-হোম থেকে বাড়ি আনা হল। এক মাসের সেই শিশু, একখন্ড মাংস-পিন্ডের মতন। তাকে মানুষ করতে গিয়ে বাড়িতেও প্রায় একটা নার্সিং হোম গড়ে উঠল।

এ-সব সেই বারো-তেরো বছর আগেকার কথা। সেই সব কথা যে আবার এতদিন পরে মনে করতে হবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

আর আশ্চর্য, এখন তিনি কিনা শুনছেন যে, সেদিন তাঁর একটি সন্তান হয়নি দুটি সন্তান হয়েছিল।

জয়রামবাবু বললেন, "কই, তখন তো ডাক্তার দয়াসুন্দর বোস আমাকে সে-কথা বলেননি। তিনি তো বলেছিলেন আমার একটি সন্তানই হয়েছে।"

চারুবালা দাসী বললে, "ডাক্তার বোস সেদিন আপনাকে মিছে কথা বলেছিলেন।"

"কেন, মিছে কথা বলেছিলেন কী জন্যে?

মাথার চামড়া শুকিয়ে যাওয়া মানে আপনার চুলেরও দফারফার শুরু...

চুল ওঠার সমস্যার মূল কারণ রয়েছে মাথার চামড়াতে। সুতরাং মাথার ওপরের এই চামড়ার যদি ঠিকমত পুষ্টি-সাধন না করেন তো, সেটি শুকিয়ে খসখসে হয়ে অপুষ্ট হয়ে পড়বে। আর তার ফলে মাথায় খুসকি হতে থাকবে, চুল চিরে চিরে যাবে ও চুল নিষ্প্রভ, নির্জীব হয়ে পড়বে....

আর সেই কারণেই আপনার দরকার বিশেষ ফর্মুলায় বানানো এমন এক হেয়ার টনিক যা মাথার এই চামড়া শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতে পারে।

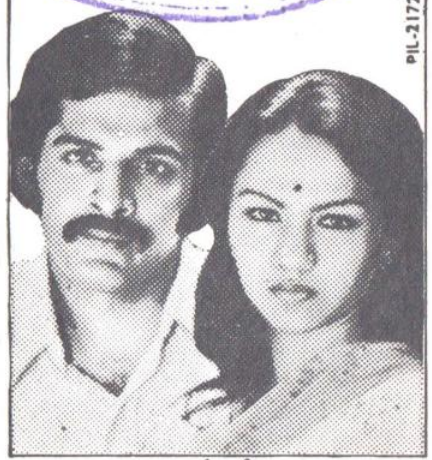

PIL-2172-I

(পরের পৃষ্ঠাটি পড়ুন)

আমাকে মিছে কথা বলে তাঁর কী লাভ হয়েছিল?"

"মিছে কথা বলে ডাক্তার বোসের অনেক টাকা হয়েছিল।"

জয়রামবাবু চমকে উঠলেন বুড়ির কথা শুনে।

বললেন, "আমাকে মিথ্যে কথা বলে ডাক্তার বোসের টাকা হয়েছিল কেমন করে তা বুঝতে পারছি না।"

বুড়ি তখনও হাঁফাচ্ছে। তার যেন দম আটকে আসছিল তখন। বললে, "টাকার মতো সর্বনেশে জিনিস সংসারে আর কিছু নেই জয়রামবাবু। নইলে ডাক্তার দয়াসুন্দর বোসের মতো অত বড় ডাক্তার যে অমন চরম অন্যায় করতে পারবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

জয়রামবাবু বললেন, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আর একটু খুলে বলুন আপনি।"

চারুবালা দাসীর চোখ দিয়ে তখন ঝর-ঝর করে জল পড়ছিল। সেই রকম কাঁদতে কাঁদতেই বুড়ি বলতে লাগল, "আমার যে দুটো পা নেই, সেও ওই টাকার জন্যে জয়রামবাবু।"

"কেন?"

"হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, শুধু ডাক্তার দয়াসুন্দর বোসই নয়, আমারও টাকার লোভ ছিল। আমিও চাইতুম আমার একটা কলকাতায় বাড়ি হোক, আমারও একটা গাড়ি হোক। ডাক্তার দয়াসুন্দর বোসের তখন অনেক টাকা ছিল। কিন্তু তবু তিনি চাইতেন তাঁর আরো অনেক টাকা হোক। যে গরিব লোক সেও যেমন টাকা চায়, যে বড়লোক সেও তেমনি আরো টাকা চায়। সব জিনিস চাওয়ার একটা শেষ আছে জয়রামবাবু। অনেক খেতে চায় অনেকে। অনেক খেতে পেলে খাওয়ার ইচ্ছেটা মিটে যায়। কিন্তু অনেক টাকা পেলেও টাকা চাওয়ার ইচ্ছেটা মেটে না। টাকা সব চেয়ে দরকারি জিনিস, কিন্তু আমি তখন ভাবতুম টাকাই একমাত্র দরকারি জিনিস। ভাবতুম টাকা পেলে আমি সব কিছু পেয়ে যাব। টাকা পেলে সুখ-শান্তি-আরাম-বিলাসিতা কিছু পাওয়ার আর আমার বাকি থাকবে না। এই টাকা চাওয়ার ইচ্ছেটা থেকেই আমার জীবনে একদিন হঠাৎ এক চরম বিপদ চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে এল।"

জয়রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী বিপদ?"

বুড়ি দু'চোখের জল এক হাতে মুছে নিয়ে একটা বিচিত্র কাহিনী বলতে লাগল আর জয়রামবাবু, সূর্যনারায়ণবাবু, চন্দ্রভানুবাবু, দেবু, জ্যোতি, বিনয় সবাই তাই শুনতে লাগল।

সেই 'বিনোদিনী নার্সিং হোম' তখন ছিল কলকাতার খুব বিখ্যাত নার্সিং হোম। ডাক্তার দয়াসুন্দর বোসেরও তখন খুব নাম-ডাক।

একদিন সেই নার্সিং-হোমে একজন ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। বেশ পয়সাওয়ালা লোক।

তিনি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন।

ডাক্তারবাবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাই আপনার?"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে। আমি আপনার সঙ্গে গোপনে একটু কথা বলতে চাই।"

"কী কথা?

"সেটা গোপনেই বলব।"

পাশের ঘরে গিয়ে দু'জনের অনেক কথা হল। কথাটা তখন আমি জানতে পারিনি। জানতে পেরেছিলাম পরে। ভদ্রলোক কথাটা খুলে বললেন।

বললেন, "আমার অনেক সম্পত্তি আছে, সমস্তই আছে। সংসারে মানুষ যা-যা কামনা করে কিছুই আমার পেতে বাকি নেই। কিন্তু একটা জিনিস আমার নেই। আমার একটা মেয়ে ছিল, সে-মেয়ের বিয়েও দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই সে-মেয়ে মারা যায়। এখন আমি সব দিক থেকেই সর্বহারা। সব কিছু থেকেও আমার কিছুই নেই। আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি আমাকে একটা ছেলে দিন।"

দয়াসুন্দর বোস বললেন, "আপনাকে আমি ছেলে কী করে দেব বুঝতে পারছি না।"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনার এখানে তো অনেক মায়েরা আসেন সন্তান প্রসব করতে। সে-সময়ে অনেক মা সন্তান রেখে মারা যান, সেই রকম সন্তান আপনি আমাকে একটা দিতে পারেন।"

দয়াসুন্দর বোস বললেন, "কিন্তু যাদের সন্তান তারা সে-সন্তান আপনাকে দেবে কেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "যাদের মাতৃহারা সন্তানকে দেখবার কেউ নেই তারা তো দিতে পারে। আমি তাদের অনেক টাকা দেব। অভাবগ্রস্ত লোকেরা টাকার বিনিময়ে তাদের বাচ্চাকে দিতেও পারে।"

দয়াসুন্দর বোস বললেন, "কত টাকা আপনি দিতে পারবেন?"

"তাঁরা যা চাইবেন।"

"যদি তারা এক লাখ টাকা চায়?"

ভদ্রলোক বললেন, "তা, তাই-ই দেব।"

ডাক্তার দয়াসুন্দর বোস কথাটা শুনে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে আমি ভাবব। আপনি কলকাতায় এলে মাঝে-মাঝে আমার কাছে আসবেন। সব সময়ে তো আর বাচ্চা রেখে মা মারা যায় না। যদি সে-রকম ঘটনা কখনো ঘটে তো আপনাকে জানাব। আপনি যখনই কলকাতায় আসবেন তখনই আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন।"

ভদ্রলোক বললেন, "মামলার ব্যাপারে আমাকে প্রায়ই কলকাতায় আসতে হয়, এলেই আপনার সঙ্গেও প্রত্যেকবার দেখা করে যাব।"

বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন। তারপর থেকে ভদ্রলোক প্রায়ই নার্সিং-হোমে আসতেন। আর খবর নিতেন কোনও মাতৃ-হারা নবজাত শিশু আছে কি না। এইভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। শেষকালে দয়াসুন্দর বোস একদিন একটা সুযোগ পেলেন। ভদ্রলোক নার্সিং-হোমে আসতেই বললেন, "একটা সন্তান পেয়েছি।"

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলে না মেয়ে?"

"ছেলে। ভদ্রমহিলার যমজ ছেলে হয়েছে, কিন্তু কেউ জানে না। ঘন্টা কয়েক আগে মাত্র হয়েছে। আপনি ঠিক সময়েই এসে গেছেন। তাদের বলব মায়ের একটা বাচ্চা হয়েছে, আমি বললে তাঁরা তা বিশ্বাস করবেন।"

ভদলোক জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে আমি টাকাটা কাকে দেব?"

দয়াসুন্দর বোস বললেন, "টাকাটা আপনি

আর এটা হ'ল মাথার চামড়া শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর উপায়...

ভেসলীন হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার অত্যন্ত খাঁটি ও পুষ্টিগুণে ভরপুর। এটি এমন তরল ও পাতলা যে কয়েক ফোঁটা মাথায় ছড়ালেই সরাসরি মাথার চামড়ার গভীরে প্রবেশ করে সারা মাথার চামড়ার পুষ্টিসাধন করবে।

ফলস্বরূপ: স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিযুক্ত চামড়া ...যা হ'ল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন চুলের মূল আধার।

আরও কি, ভেসলীন হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার আপনার চুলকে রাখে চিকন ও পরিপাটি—সর্বদাই।

ভেসলীন®

হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার—প্রতিটি বিন্দুই চামড়া শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে।

PIL-2172-2

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়
সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান
যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই
কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া, এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত!

কোল্ডরিন

সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

আমাকে দেবেন।"

"আপনি কত নেবেন?"

ডাক্তার দয়াসুন্দর বোস বললেন, "আপনি তো বলেইছেন যে, এক লাখ টাকা দেবেন। কিন্তু আমি ছাড়া আর একজন ঘটনাটা জানে। সে আমার নার্স। সে যদি কাউকে বলে দেয় তো তাতে আমারও বিপদ, আপনারও বিপদ। তাই তাকেও কিছু দিতে হবে। তারও খুব টাকার অভাব। তার নিজের বাড়ি নেই। বাড়ি-ওয়ালা তাকে খুব অত্যাচার করছে। তার নাম চারুবালা দাসী। তাকে যদি পঁচিশ হাজার টাকা দেন তাহলে তার মুখও বন্ধ হবে। আর তার খুব উপকারও হবে। সে তাহলে ওই টাকা দিয়ে একটা বাড়িও কিনতে পারবে।"

তা সেই ব্যবস্থাই পাকা হল। ভদ্রলোক কোথা থেকে অত টাকা যোগাড় করলেন কে জানে! ডাক্তার দয়াসুন্দর বোসকে এক লাখ টাকা নগদ দিয়ে দিলেন আর চারুবালা দাসীকে দিলেন পঁচিশ হাজার টাকা।

ডাক্তার চারুবালা দাসীকে সাবধান করে দিলেন। বলে দিলেন, "কথাটা যেন কেউ না জানতে পারে, বুঝলে চারু? শুধু তুমি জানলে আর আমি জানলুম। জয়রামবাবু খবর নিতে এলে তাঁকে বলে দিও যে, তাঁর ছেলে ভাল আছে।"

চারুবালা দাসী খুব খুশি। ডাক্তার দয়াসুন্দর বোসও খুশি। চারুবালা দাসী জীবনে একসঙ্গে অত টাকা কখনও দেখেনি। সেই টাকা দিয়ে একটা পুরনো বাড়ি কিনে ফেললে।

গল্পটা বলতে বলতে বুড়ি থামল এবার। কথাগুলো বলতে খুব কষ্ট হয়েছে। এক গ্লাস জল চেয়ে খেয়ে নিল।

জয়রামবাবু অনেক আগ্রহ নিয়ে গল্পটা শুনছিলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

বুড়ি বলতে লাগল, "কিন্তু বাবা, পাপের টাকা কখনও হজম হয় না। তারপরে বছর কাটতে-না-কাটতেই এক কান্ড হল। ডাক্তার দয়াসুন্দর বোস একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোটরে করে নার্সিং হোমে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা লরির ধাক্কা লেগে তাঁর গাড়ি চুরমার হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মারা

গেলেন। আর আমি? আমি ডিউটি সেরে বাসে চড়ে বাড়ি ফিরছিলুম। বাস থেকে যেই নেমেছি আর সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একটা গাড়ি এসে আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম। যখন জ্ঞান হল দেখলুম আমি একটা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি। আর আমাকে বিছানায় বেল্ট দিয়ে এঁটে বেঁধে রাখা হয়েছে। শুনলুম আমার দুটো পা-ই নাকি কাটা হয়ে গেছে। যেই আমার জ্ঞান হল আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আমাকে ইনজেকশান দিয়ে অজ্ঞান করে দিলে। কিন্তু তারপর কত কাল কেটে গেল সেই ডাক্তার দয়াসুন্দর বোসের নার্সিং হোমও নেই, সেই ডাক্তারও নেই, আর আমিও সেই থেকে শয্যাশায়ী। আজ এত বছর পরে আমি আজ আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি, কারণ মারা যাওয়ার আগে আপনাকে সব কথা বলে না গেলে আমি পরলোকে গিয়েও শান্তি পাব না। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি, আমার পা জোড়া থাকলে আপনাকে বাবা আর কষ্ট দিতুম না, আমি হেঁটেই আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে যেতুম।"

বলে বুড়ি হাঁফাতে লাগল আর কাঁদতে লাগল।

তারপর কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "বলুন, আপনি এই শেষ সময়ে আমাকে ক্ষমা করলেন তো?"

জয়রামবাবু বললেন, "যা ঘটে গেছে তার জন্যে আর ভেবে কী হবে? কিন্তু শুধু একটা কথা বলুন, সেই অন্য ছেলেটার সেদিন কী হল?"

বুড়ি বললে, "সেই ভদ্রলোক আমাদের দুজনকে টাকা দিয়ে তো চলে গেলেন। সঙ্গে একদিনের বাচ্চা সেই ছেলেটিকেও নিয়ে গেলেন। কিন্তু শুনে অবাক হবেন বাবা, কথায় আছে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তা সেই কল বাতাসেই নড়ল কিছুদিন পরে।"

"কী রকম?"

"সেই ভদ্রলোক কয়েক মাস পরে এসে জানালেন যে, সে ছেলেও নাকি তাঁর ভোগে লাগেনি। অত টাকা খরচ করে ছেলে কিনলেন, ডাক্তার দয়াসুন্দর বোসও টাকা পেয়ে নতুন গাড়ি কিনলেন, আমিও টাকা পেয়ে এই বাড়ি কিনলুম। কিন্তু কোনও কিছুই কারো ভোগে লাগল না।"

"সে ভদ্রলোক কি আবার কখনও আপনার কাছে এসেছিলেন?"

বুড়ি বললে, "হ্যাঁ, এসে বলেছিলেন যে আরো টাকা দেবেন তিনি, যদি ওই রকম আর একটা মা-হারা ছেলে তাঁকে দিই—"

"কিন্তু তাঁর সেই ছেলেটা হারাল কী করে?"

বুড়ি বললে, "তা ঠিক জানি না, আর এতদিন পরে সে-সব কথা মনেও নেই। শুধু আপনার ঠিকানাটা এক টুকরো কাগজে লেখা ছিল বলেই আপনাকে খবর দিয়ে ডাকিয়ে এনেছি।"

জয়রামবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সে ভদ্রলোক কোথায় থাকেন তা জানো তুমি? তাঁর নাম কী তোমার মনে আছে?"

বুড়ি অনেক ভাবল, কিন্তু মনে করতে পারলে না।

সূর্যনারায়ণবাবু এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। এবার বললেন, "আমিই সেই ভদ্রলোক।"

জয়রামবাবু চমকে উঠে বললেন, "তুমি? তুমিই আমার ছেলেকে এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তখন কি জানি সে তোমারই ছেলে?"

বুড়ি জিজ্ঞেস করলে, "আপনার নাম কী বাবা?"

সূর্যনারায়ণ সিং বললেন, "আমার নাম সূর্যনারায়ণ সিং।"

বুড়ি বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে ভদ্রলোকের নাম সূর্যনারায়ণ সিং—"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

॥ ভুল শুধরে নাও ॥

১০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় শব্দ-সন্ধানের ছকে সংকেত-সংখ্যা ভুল ছাপা হয়েছে। দ্বিতীয় সারির শেষ ঘরে কোনো সংখ্যা বসবে না—৯-সংখ্যাটি বসবে তৃতীয় সারির তৃতীয় ঘরে, আর ওই ঘর থেকে ১০-সংখ্যাটি সরে আসবে পঞ্চম ঘরে। যারা বুদ্ধি খাটিয়ে এই ভুল শুধরে নিতে পেরেছ তাদের বাহবা জানাই, যারা পারোনি তাদের জন্য দুঃখিত।

ভুল হয়েছে

শমীন্দ্র ভৌমিক

নিঝুম রাতে হনহনিয়ে
যাচ্ছে কে এই বাগান দিয়ে ?
দুলছে যেন এদিক ওদিক
মস্ত তার ঐ গা-টা।
এসব দেখে ভিরমি খেয়ে.
ভাবেন কাকা একলা পেয়ে.
গুঁড়িয়ে না দেয় ? বাব্বা কেমন—
ধুমসো ও দুই পা-টা।
ও মা, এ সব কাণ্ড কী এ.
চাঁদ ভেসে যায় আকাশ দিয়ে
ভুল হয়েছে গাছ দুটোর-ই.
মাঝ দিয়ে তাঁর হাঁটা।

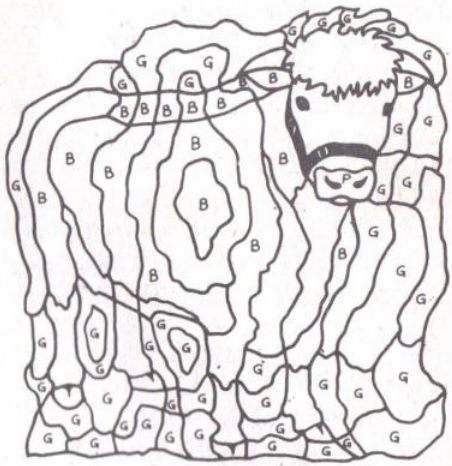

'জি' মার্কা খোপগুলি গ্রীন অর্থাৎ সবুজ, 'বি' মার্কা খোপগুলি ব্রাউন অর্থাৎ বাদামি আর 'পি' মার্কা খোপগুলি পিঙ্ক অর্থাৎ হাল্কা-লালে ভরাট করো।

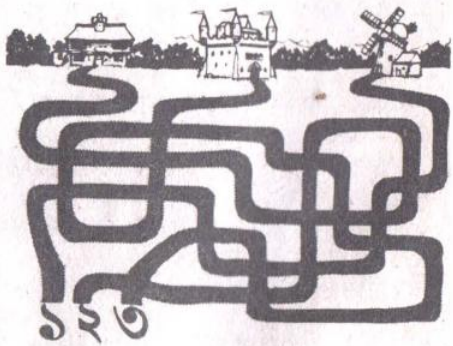

কোন পথে এগোলে কোন বাড়িতে পৌঁছবে, চটপট ভেবে নাও। তারপর পথ ধরে এগিয়ে দ্যাখো, তোমার ধারণা ঠিক কি না।

বাজারের সেরা

বীণা® ফাউন্টেন পেন
বলপেন • রিফিল • নিব
ইণ্ডিয়া লাইটহাউস
৩৭এ, রামমোহন মল্লিক লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭
PRASA/IL-4/8/80

টাট্টু

কার্ত্তিক ঘোষ

টুবলুদের টেবিল-ঘড়িটা অনেকদিনের পুরনো। ওর দাদুর আমলের।

দিনরাত শুধু টিক-টিক করে। কিন্তু সময়টা ঠিক দেয় না। সেই নিয়ে প্রায়ই রাগ করেন টুবলুর মা। রোজই ওর বাবা ঘড়িটাকে দেব-দেব করেন, কিন্তু কে জানে কেন হয়ে আর ওঠে না।

অথচ এই প্রথম ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে টুবলু।

সময় মতন ইস্কুলে বেরোতে হয়। মা ওকে চান-টান করিয়ে জামা-জুতো পরিয়ে খেতে দেবেন কি, এগারোটা বেজে যায়। তাড়াহুড়ো করে খেয়ে নেয় টুবলু। তারপর হয়ত অনেকক্ষণ বাদে রিংকিদিরা দল বেঁধে ওকে ডাকতে আসে।

টুবলুর মা বলেন, "জানিস তো, আজ কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেল তোদের। দ্যাখ না কখন এগারোটা বেজে গেছে।"

রিংকিদি বলে, "এমা। কাকীমাদের ঘড়িটা যেন কেমন। আমাদের ঘড়িতে এই তো সাড়ে দশটা বাজে দেখে এলুম।"

টুবলুর মা অমনি ঘড়িটার ওপর রাগ দেখান। কিন্তু পুরনো ঘড়িটার দিকে চেয়ে শুধু মায়া হয় টুবলুর। আহা, বেচারি ঘড়ি। ও একদিন একটু বেশি বেজে গেলেই কার কী এমন ক্ষতি হয় শুনি? মা যেন কেমন। সব সময় শুধু ঘড়িটার ওপর খিটির-মিটির।

একদিন সন্ধেবেলা আবার টুবলুর বাবার সামনেই কথা উঠল টেবিল-ঘড়িটার। ওর মা বললেন, "সারাতে দেবে তো দাও, না হলে ওটাকে আর ঘরে রেখো না।"

বাবার মনটা যেন কদিন হল কেমন-কেমন। ভাল করে কথা বলেন না। খেতেও চান না। টুবলু ওর বাবাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, "কেন মা, ওকে ঘরে রাখবে না?"

মা বললেন, "রেখে কী হবে বলো, ও তো ঘড়ি নয়। ও একটা ঘোড়া।"

"ঘোড়া?"

টুবলু হাঁ হয়ে গেল শুনে। বললে, "হ্যাঁ বাপি, দাদুর ঘড়িটা সত্যি-সত্যি ঘোড়া হয়ে গেছে?"

মা বললেন, "কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?"

টুবলু বললে, "এমা। ঘোড়া হয়েছে তো ঘোড়ার পা কই?"

মা ঘড়িটার ছোট্ট দুখানা পা দেখিয়ে বললেন, "ঐ তো দেখা যাচ্ছে।"

টুবলু বললে, "ঘোড়ার তো চারটে পা।"

অনেকক্ষণ বাদে ওর বাবা একটু মুচকি হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, "আর দুটো শিগগির গজাবে মনে হচ্ছে।"

টুবলুর তবু বিশ্বাস হল না তেমন। রাত্রে মায়ের পাশে শুয়ে বললে, "আচ্ছা মা, ঘোড়ার কান থাকে না?"

"থাকে বৈকি।" বলেই পাশ ফিরে শুয়ে মা বললেন, "এখন ঘুমোও।"

কিন্তু টুবলুর কখনও ঘুম ধরে। ও শুধু নীল মশারির মধ্যে শুয়ে-শুয়ে টেবিল-ঘড়িটার দিকে চেয়ে থাকে। দিব্যি কেমন টিকটিক, ঠিক-ঠিক করছে ঘড়িটা। কিন্তু ঘোড়া কি কখনো টিকটিক করে নাকি? ধুস, মা কিচ্ছু জানেন না। ঘোড়া তো চিঁহি-চিঁহি করে। বারে! টুবলু কি আর এত বোকা। ঘোড়া দ্যাখেনি বুঝি ও? সেই যে মামার বাড়িতে একবার, না, না, একবার কেন, কলকাতায় বেড়াতে গিয়েও তো একবার ঘোড়া দেখছিল টুবলু।

তবে ঘড়িটা সত্যিই যদি ঘোড়া হয়ে যায় হঠাৎ তাহলে কিন্তু খুব একটা মজা না হয়ে আর যায় না। টুবলু মনে মনে আগে থেকে সব ভেবে নিলে। ঘড়িটা ঘোড়া হয়ে গেলেই টুবলু আগেভাগে ওকে বেঁধে ফেলবে ওদের উঠোনের আমগাছটায়। তারপর তৈরি করবে একটা কঞ্চির চাবুক।

না। থাকগে। চাবুক-টাবুক কী হবে। আহা। ঘোড়াটাকে কোনোদিন একটুও মারবে না টুবলু। বরং দুষ্টুমি করলে একটু-আধটু বকে দেবে।

তবে আমগাছটার সঙ্গে বেঁধে রাখলেই তো হবে না। ঘোড়াটাকে ঘাস আর ছোলা খেতে দিতে হবে। তারপর একদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে অনেক দূরে।

প্রথমে কোথায় যাবে টুবলু?

মামাবাড়ি?

না, না। মামাবাড়ি কেন, পিসিমণির বাড়ি সব্বার আগে। সেই শিউলি-কুঁড়ির হাটতলা পেরিয়ে একবারে দিঘির ধারের রাস্তা দিয়ে খুশিডাঙা। পিসিমণির বাড়ি ঘুরে আর একদিন যেতে হবে...কোথায় যেতে হবে, কবে যেতে হবে সে সব আর ঠিকঠাক ভাবতে পারলে না টুবলু। ঘুমে তার চোখ দুটো জুড়ে এল।

তাই পরের দিন সকাল থেকেই টুবলুর মাথায় চেপে বসল টেবিল-ঘড়িটা। ঘোরে-ফেরে আর ঘড়িটাকে একবার করে দেখে। কখনও হাত বুলোয়। কখনও দম দেওয়া চাবিটায় হাত দিয়ে ভাবে, ঘড়িটা ঘোড়া হয়ে গেলেই এইটা নিশ্চয় তার ল্যাজ হয়ে যাবে।

এমনি করে বেশ কদিন কেটে গেল। কিন্তু ঘড়িটা কিছুতেই আর ঘোড়া হচ্ছে না দেখে টুবলু ভাবলে, ধুস, মা নিশ্চয়ই ঠিক বলেননি। তাই ওর বাবাকে ধরে বসল একদিন।

"বলো না বাপি, ঘড়িটা এখনও ঘোড়া হচ্ছে না কেন?"

টুবলুর বাবা ছেলের কথায় তেমন মন দিলেন না। তবু বললেন, "হবে বৈকি।"

টুবলু তবু বললে, "কবে হবে? শনিবারে?"

"না, না। বোধ হয় রবিবারে।" বলতে বলতে টুবলুর বাবা অন্য কাজে চলে গেলেন।

সেইদিন থেকেই দিন গোনা শুরু হয়ে গেল টুবলুর। কাউকে দেখলেই বলে, "আজ কী বার বলো তো?"

কেউ ঠিক বলে। কেউ ঠিক বলে না, মজা করে।

তখন মাকে গিয়ে ধরে। "বলো না মা, আজ কী বার?"

মা হয়ত বলেন, "বুধবার।"

টুবলু অমনি জিজ্ঞেস করে, "তাহলে রবিবার আসতে আর কদিন দেরি আছে বলো না?"

ছেলের কথা শুনে মা অবাক হন। বলেন "কেন, রবিবার এলে কী হবে শুনি?"

টুবলু তখন আনন্দে হাততালি দিতে দিতে ছোটে—"ঘোড়া হবে একটা...সত্যিকার ঘোড়া হবে..."

টুবলুর কথার মাথামুণ্ডু কেউ বোঝে না। তবু কেউ-কেউ টুবলুকে রবিবারটা কবে আসছে তার খবর আগেভাগে দিয়ে রাখে।

শনিবার রাত্রে আর ঘুম ধরে না টুবলুর।

মশারির ভেতর থেকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে ঘড়িটাকে।

টুবলু যে জেগে আছে সে কথা বাবা-মা কেউ জানেন না। তাই বোধ হয় মা কথা কাটাকাটি করেন বাপির সঙ্গে। টুবলু কিছুটা শোনে, কিছুটা শোনে না। ঘড়িটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ বুজে আসে।

তবু কানে আসে, মা রাগ করছেন বাপির ওপর। কেমন করে রেশন উঠবে কালকে। কী করে বাজার-দোকান হবে?

বাপি শুধু বিড়-বিড় করে 'লক আউট' উঠে যাবে হয়ত...শিগগির উঠে যাবে

বলছেন। 'লক আউট' আবার কী? টুবলু জানে না। তাই ভাবে, মাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করতে হবে সক্কালে উঠে। কিন্তু ঘড়িটার ব্যাপারে মা কি বাপি কেউ আর কিছু বলছেন না কেন? দূর ছাই, ঘড়িটা আর কত রাতে ঘোড়া হবে কে জানে। টুবলুর ঘুম ধরছে না বুঝি? না, আর জেগে থাকতে পারবে না টুবলু। এইবার ঘুমিয়ে পড়বে ঠিক।

কিন্তু ঘড়িটা হঠাৎ টিকটিক করতে করতে থেমে গেল কেন?

"ও বাপি। ও মামণি?" এই যা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন কী হবে তাহলে? ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল কেন।

টুবলু সুড়-সুড় করে মশারি তুলে খাট থেকে নামতেই দেখলে ঘড়ি কোথায়। টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া। দিব্যি চেয়ে আছে টুবলুর দিকে।

টুবলু চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিল ওর মাকে।

কিন্তু টাট্টু ঘোড়াটাই হঠাৎ ফিসফিস করে ওকে বললে, "আহা। চেঁচিও না। বড়দের কাছে আমার বড্ড লজ্জা করে। তারচে চলো, আমরা দুজনে কোথাও ঘুরে আসি।"

টুবলু বলল, "আমি তোমার পিঠে চড়ে পিসিমণির বাড়ি যাব।"

টাট্টু বললে, "সে তো দারুণ মজা।"

টুবলু বললে, "সেখান থেকে ফিরে আমি মামাবাড়ি যাব। কলকাতা যাব।" তারপর একটু থেমে বললে, "তুমি কলকাতা চেনো?"

টাট্টু তখন চিঁহি-চিঁহি করে বললে, "তা আবার চিনি না। সেই তো আমার আসল ঠিকানা।"

টুবলু এবার হাঁ করে রইল।

ঘোড়া বললে, "কলকাতা থেকেই তো আমি ঘড়ি হয়ে একদিন এসেছিলুম এ-

ভূ-গোলমাল

মৃণালকান্তি দাশ

''টিটিকাকা কারো কাকা নয়''—
যত আমি বলি, ''শোন্, টুকি,
ভূগোলেতে চিরদিন তুই
রয়ে গেলি একেবারে খুকি।''
তবু সে আবার ভুল করে—
বলে, ''কাকু, মেসোপটেমিয়া
মাসির জন্য মেলা থেকে
এনেছিল ছোট্ট পাপিয়া।''
আমি বলি, ''দূর, বোকা মেয়ে,
ওটা এক জায়গার নাম।
কতবার বোঝাব যে তোকে
আস্মানে মোটে নেই আম!
রাশিয়ায় খাসিয়ারা থাকে,
ডাবলিনে পাওয়া যায় ডাব—
ভূগোলের এই বুঝি জ্ঞান?
বইটার সাথে নেই ভাব!
ভূগোলে অমন কাঁচা হলে,
কানাডায় গিয়ে হবি কানা।
মনট্রিলে হারাবি যে মন,
যদি না ভূগোল থাকে জানা!''

বাড়িতে। তোমার দাদুই আমাকে এনে-ছিলেন। সে কি আর আজকের কথা? বাজতে বাজতে আমিও কবে বুড়ো হয়ে গেলুম জানি না। তারপর বুড়ো হয়ে আজ আমার কী দশা হয়েছে সে তো তুমি দেখছই। বলতে বলতে টাটুর চোখ বেয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা।

টুবলুর মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল এবার। বললে, "তুমি কাঁদছ কেন? কেঁদো না। আমি তোমাকে খুব ভালবাসব।"

বলতে বলতে টুবলুর চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে এল।

টাটু বললে, "এই রে। কথা বলতে বলতে দেখ কত দেরি হয়ে গেল। চলো, চলো, তোমার পিসিমণির বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়ি।"

বলতে বলতে টুবলুকে পিঠে চাপিয়ে টাটু ছুটল টগবগ করে। উঠোন পেরিয়ে বাগান-বাড়ির রাস্তায়।

কিন্তু কী কাণ্ড!

পিছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল হঠাৎ। "এই টুবলু—টুবলু—"

আর যেই না এই শুনে পিছন ফিরে চাওয়া এমনি টুবলুর চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর মায়ের মুখখানা।

তখন কোথায় সেই টগবগে টাটু, বাগান-বাড়ির রাস্তা, আর কোথায় কী। সব একবারে হিজিবিজি হয়ে গেল ওর কাছে। চোখ-রগড়াতে রগড়াতে বিছনায় উঠে বসেই হাঁ করে চেয়ে রইল টেবিলটার দিকে।

আজ অনেকদিন বাদে টুবলুর দিকে চেয়ে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন ওর বাপি। হাসতে হাসতেই বললেন, "ঘড়িটাকে খুঁজছ নাকি? এমা, জানো না—সেটা তো ভোরবেলাই ঘোড়া হয়ে পালিয়ে গেছে আমাদের বাড়ি থেকে।"

বলতে বলতে হঠাৎ যেন গলাটা কেমন ধরে এলো বাপির।

টুবলু ঠিক বুঝতে পারলে না কিছু।

টেবিলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাপি এখনও হাসছেন, না ঝর-ঝর কাঁদছেন, টুবলুর মতন।

ছবি সুনীল শীল

কাজিরাঙ্গার বাইসন

সেই যে সেদিন বাইসনটা
লুকিয়ে ছিল বনে,
এমন করে করল তাড়া
আজও পড়ে মনে।
বেড়াচ্ছিলাম বনের ধারে
দেখতে বনের শোভা,
সূর্য তখন পশ্চিমেতে
অনেকখানিই ডোবা।
দিচ্ছে হাওয়া মৃদু-মৃদু
লাগছে মজা বেশ,
কাজিরাঙ্গার জঙ্গলটার
নেইকো বুঝি শেষ।
হঠাৎ দেখি বনের মাঝে
জ্বলন্ত দুই চোখ,
করলে আমায় এমনি তাড়া
ভুললাম রোগ-শোক।

ঝুমকা ভাদুড়ী (বয়স ১৫)

খেলা

খেলা খেলা খেলা
হয়ে গেল বেলা
খেলতে খেলতে জুটে গেল
কতগুলো চেলা।

কৌশিক চৌধুরী (বয়স ৮)

আর কাঁদি না

আমি আর সুপর্ণা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। আমরা সব সময় একসঙ্গে থাকতাম। আমরা যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি নাটক করেছিলাম। সেই নাটকে আমি রাজা হয়েছিলাম, সুপর্ণা হয়েছিল রানী।

আমরা দুজনে একসঙ্গে অনেক ছবি তুলেছিলাম, আমরা দুজনে পুরস্কারও পেয়েছিলাম। আমাদের দুজনকে অন্য সব ছেলেমেয়েরা রাজা ও রানী বলে খেপাত। পঞ্চম শ্রেণীতে উঠে আমি অন্য স্কুলে চলে গেলাম।

আজ দু বছর আমি পুরনো স্কুল ছেড়ে দিয়েছি। প্রথম প্রথম সুপর্ণার জন্য আমার খুব কষ্ট হত। প্রায়ই কাঁদতাম। এখনও মাঝেমধ্যে ওর জন্যে কষ্ট হয়, কিন্তু আর কাঁদি না।

মায়া চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১২)

ছবি এঁকেছে অঞ্জন দাস (বয়স ৪)

ছবি এঁকেছে তন্ময় সামন্ত (বয়স ৭)

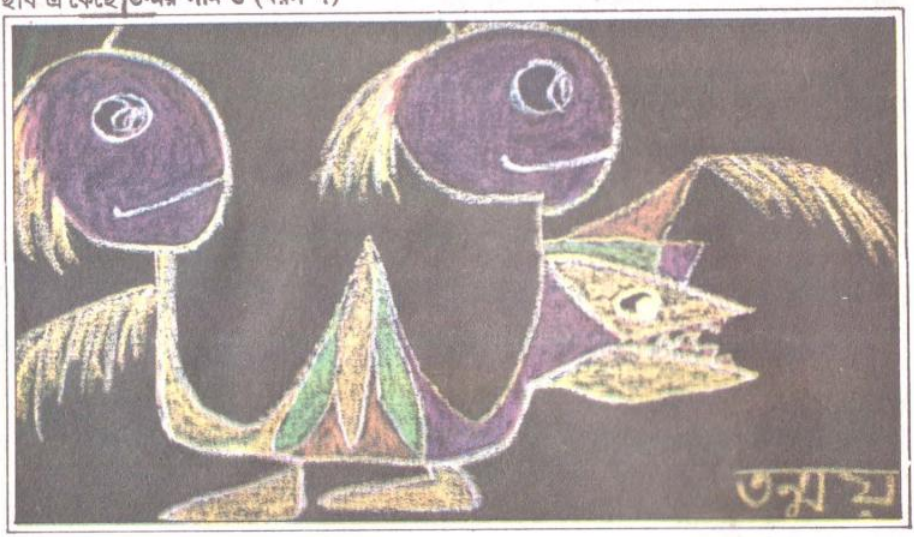

মেঘমল্লার

আমাদের মস্ত বড় বাড়ি
সেখানে অনেক মোটরগাড়ি
লিফ্‌টে ওঠা-নামা,
বলি একটু থামা।
খেলতে যাব লেকে
পথটি এঁকে বেঁকে।
লেকে অনেক জল,
আমি খেলব বল।

তপান্ত চট্টোপাধ্যায় (বয়স ৬)

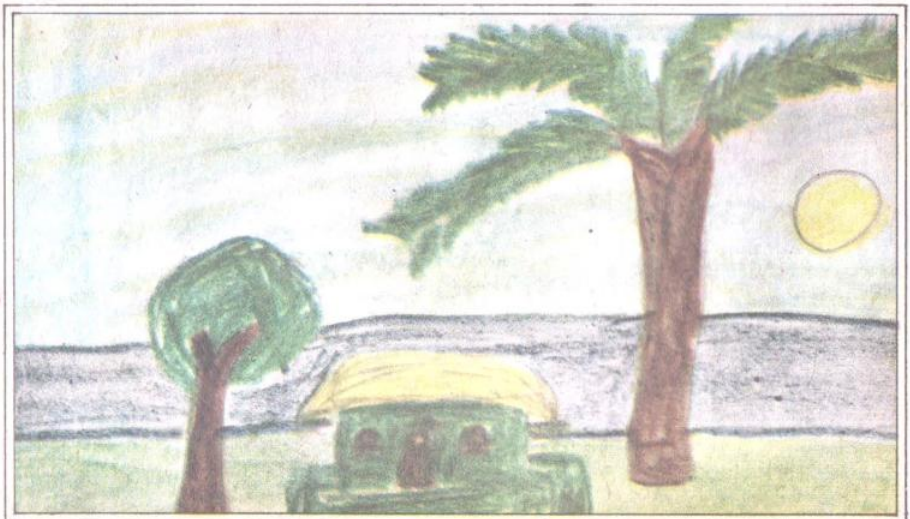

ছবি এঁকেছে আনন্দমোহন (বয়স ৭)

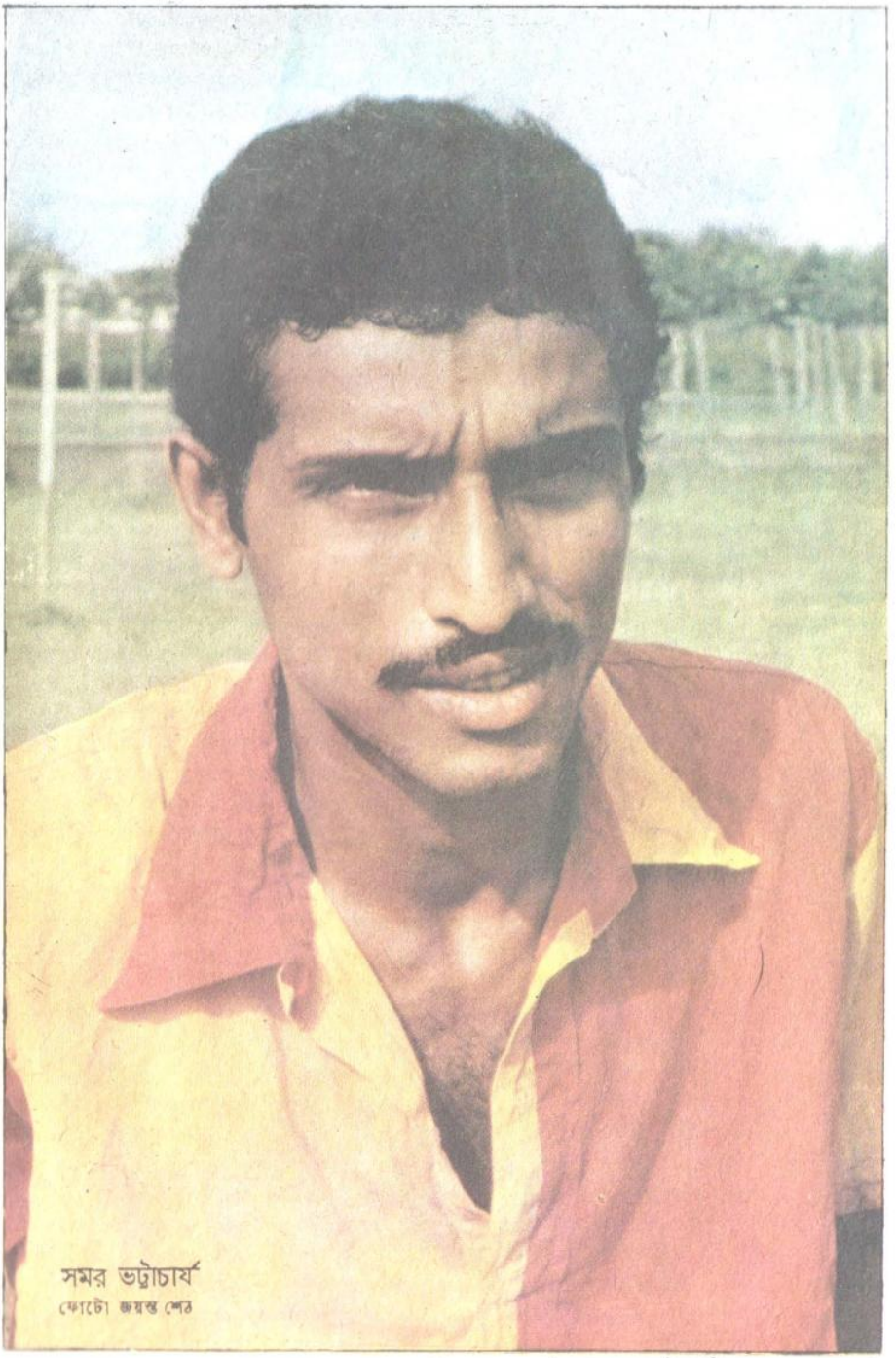

সমর ভট্টাচার্য
ফোটো জয়ন্ত শেঠ

বড় হওয়ার পথে সমর

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

কলকাতার ফুটবল মরসুমে বিভিন্ন ক্লাব যখন পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দেয় তখন হঠাৎ মাঠে উপস্থিত হলে অনেক চেনা খেলোয়াড়কেও চিনতে অসুবিধে হতে পারে। কারণ, অনুশীলনের সময় ক্লাবের জার্সি পরার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই বলে যে যার খুশিমতো জামা পরে আসে। তবে, ইস্ট-বেঙ্গল মাঠে প্র্যাকটিসের সময় হাজির হলে একজন খেলোয়াড়কে চিনতে কারও অসুবিধে হয় না। খেলোয়াড়টির নাম সমর ভট্টাচার্য —ইস্টবেঙ্গলের অন্যতম স্টপার ফুলব্যাক। সমরকে চিনিয়ে দেয় তার ছ'ফুট এক ইঞ্চি উচ্চতা। মোহনবাগানের সুব্রত তো বেশ ভালই লম্বা। সমর তার চাইতেও। কোচ পি কে ব্যানার্জি মাঝে মাঝে তাঁর খেলোয়াড়দের দৌড় করান। আজ পর্যন্ত কোনওদিন দেখিনি যে, দৌড়ে সমরকে কেউ হারাতে পেরেছে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে সমর বরাবরই ফার্স্ট হন। সত্যি, কী দুর্দান্তই না সমরের স্টেপিং। অন্যদের তিনটে স্টেপে যা ওঁর দুটোয় তা।

কলকাতার কাছে বাউড়িয়ার বলরামপোতা অঞ্চলে সমরদের বসবাস। ওঁর বাবা শ্রীপদ ভট্টাচার্য ডাক ও তার বিভাগের কর্মী। বাড়িতে সমরের মা, একটি বোন আর স্ত্রী আছেন। সমর হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করেছেন রামরাজাতলার ধারশা মিহিরলাল খান ইনস্টিটিউশন থেকে।

সমরের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা আছে, কিন্তু, গত বছর মোহনবাগানে সমর তেমন কিছু সুযোগ পাননি। কারণ ট্রফি-শিকারের যুগে একজন অল্প-অভিজ্ঞতার ছেলেকে প্রথম টীমে ঢোকানোর ঝুঁকি মোহনবাগানের তদানীন্তন কোচ পি কে ব্যানার্জি নিতে পারেননি। কিংবা, নিতে চাননি।

গত বছর মনে হয়েছিল দুর্ভাগ্যটা সমরের। এই বছর মনে হচ্ছে, না, দুর্ভাগ্যটা মোহনবাগানেরই। ফেডারেশন কাপেই সমর সেটা বুঝিয়ে দিলেন। তখন মোহনবাগানের সমর্থক ও কর্মকর্তাদের চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। অবশ্য মোহনবাগান যে সমরকে এ-বছর একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল তা নয়। সমরই "প্রদীপদা"র অনুগামী হয়ে ইস্টবেঙ্গলে আসেন।

গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যাঁদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন, ও-সব জায়গায় ফুটবল নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা কলকাতার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। সমরদের এলাকার "থানা লীগ"কে ঘিরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় প্রতিবার। ঐ থানা লীগের খেলাতেই সমরের ফুটবল-জীবনের প্রথম পদক্ষেপ। সাত বছর আগে সমর কলকাতা ফুটবল লীগের দ্বিতীয় ডিভিসনের টীম মৌরী স্পোর্টিংয়ে খেলবার সুযোগ পান। তখন ওঁর বয়স (জন্ম ২১ জুন, ১৯৫৪) উনিশ বছর। পরের বার সমর যান চন্দ্র মেমোরিয়ালে, যার বর্তমান নাম রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব। অবশ্য সে-সময় চন্দ্র দ্বিতীয় ডিভিসনে ছিল। চার বছর ওখানে খেলেন সমর. এবং এর মধ্যে শেষের বছরটিতেই (১৯৭৭) চন্দ্র প্রথম ডিভিসনে ওঠে। এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। আটাত্তরে সমর খেলেন ইস্টার্ন রেলে। পরের বার ওঁকে মোহনবাগানে আনেন পি কে। আর এ-বারের কথা তো আগেই লিখেছি।

কিন্তু ভরসা করে লিখতে পারছি না যে, সমর ধাপে ধাপে ওপরে উঠে এসেছেন। এখন সমরের ফর্ম এমনই যে, ভারতীয় দলে স্থান পেলেও অবাক হবার কিছু নেই। তাহলে কথাটা লিখতে বাধা কোথায়? বাধা এইখানেই যে, এখন যদি সমর ভারতীয় দলে ডাক পান তা-হলে সেটা হবে কয়েকটা ধাপ লাফিয়ে ওঠা। কারণ সমর এখন পর্যন্ত কোনও স্তরেই কোনও জাতীয় প্রতিযোগিতার খেলেননি—স্কুল, জুনিয়র বাংলা, সিনিয়র বাংলা—কিছুই না।

খেলাধুলোর ব্যাপারে সমরকে যাঁরা নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন "সুনীলদা" (ভট্টাচার্য), অজয় লাহিড়ী (বিমানের দাদা), "নিখিলদা" (নন্দী)। এবং বলা বাহুল্য "প্রদীপদা"। এ-ছাড়া আছেন অমরনাথ দে, যিনি সমরকে মৌরী স্পোর্টিংয়ে এনে কলকাতা ফুটবল লীগের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের প্রতি সমরের কৃতজ্ঞতাবোধ গভীর। আর কোচ হিসেবে 'প্রদীপ' ছাড়া

সমরের প্রিয় 'নিখিলদা'। অরুণ ঘোষের প্রতিও সমর যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল যদিও ওঁর কাছে এখনও পর্যন্ত কিছু শেখার সুযোগ সমরের আসেনি।

গতবার মোহনবাগানে সমর পুরো ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচ দিন। জিজ্ঞাসা করলাম, "দিনের পর দিন টাচ লাইনের ধারে বসে থাকতে কষ্ট লাগেনি বা নৈরাশ্যবোধ পেয়ে বসেনি?"

সমর বললে, "বিশ্বাস করুন, আমার এতটুকু মন খারাপ হয়নি। জানতাম প্রদীপদার কাছে আছি, কোনও ভয় নেই।"

মোহনবাগানে সমর যতটুকুই খেলে থাকুন না কেন, এ-পর্যন্ত সেরা খেলা খেলেছেন মেরুন-সবুজ জামা গায়েই। গতবার লীগে স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে খেলাটিই নিজের সেরা খেলা বলে সমর মনে করেন। আর দার্জিলিংয়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের বিরুদ্ধে গোল্ড কাপ ফাইনাল হল ওঁর স্মরণীয় খেলা। গোল্ড কাপ জেতার পরের মুহূর্তের মতো সোনালি মুহূর্ত সমরের জীবনে আর আসেনি। অবশ্য এবারে ফেডারেশন কাপেও সমরের ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয়েছে, কিন্তু সে তো যুগ্ম-জয়। তার রঙ অনেকখানি ফিকে। যাই হোক, এ-দুটি ক্ষেত্রেই সমরকে খেলতে হয়েছে রীতিমত শক্তিশালী দুই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

"এমন কোনও খেলা আছে কি যাতে খুবই খারাপ খেলেছেন?" প্রশ্নের উত্তরে সমর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "খারাপ না খেললে নিজের ভুল বুঝব কী করে?"

ফেডারেশন কাপে খেলার অভিজ্ঞতা সমরের কাছে অতি সুখের। মানের দিক থেকে ভারতের সেরা ট্রফি, তা ছাড়া কলকাতার বাইরের বাছাই দলগুলি খেলতে এসেছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, সত্তর-আশি হাজার দর্শকের সামনে খেলার সুযোগ তো আর প্রতিদিন আসে না।

সকালে অনুশীলনের পরেই সমর সোজা চলে যান অফিসে—ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে। দেখলাম, আড্ডা, গল্প-গুজব ইত্যাদি সমরের বিশেষ আসে না। অবশ্য তাই বলে কি আর সমরের বন্ধুবান্ধব নেই? ময়দানে অজস্র বন্ধু আছেন। আর ময়দানের বাইরেও কিছু। এঁদের মধ্যে আছেন হরিদাস চক্রবর্তী। ওঁর সঙ্গে সমরের অনেকখানিই সময় কাটে। আর কাটে গান শুনে কিংবা বই পড়ে।

সমরের জীবনের লক্ষ্য কী? প্রশ্নটা ওঁকে না করলেও চলত। উত্তরটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বললেন, "খেলাধুলোয় বড় হওয়া।"

"সমরের নিষ্ঠা আছে। আছে কষ্ট করার ক্ষমতা। তা-ছাড়া, ও বাজে কথার ছেলে নয়। চন্দ্র মেমোরিয়ালে খেলার সময় থেকেই তো ওকে দেখে আসছি—ওর স্কিল চমৎকার। দু পা পরিষ্কার। কলকাতায় যাট গজের কিক মারতে আর ক-জন পারে? টাইমিং জ্ঞান অপূর্ব। তেমনি অ্যাকসিলারেশন, আপনারা অনেকেই একটা জিনিস জানেন না, সমর ফ্রী-কিক মারার ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট। সেবার জব্বলপুরের টুর্নামেন্টে বলতে গেলে তো ছেলেটা একাই ইস্টার্ন রেলকে জিতিয়ে দিল। ফ্রী-কিকে পাচ-পাঁচটা গোল করেছিল, তার মধ্যে দুটো আবার ফাইনালে। অবশ্য ওর পরিমার্জন দরকার। ট্যাকলিং আরও উন্নত করতে হবে। আর পাওয়ার গেম ডেভেলপ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ও উঠে আসবেই। আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে না, নিজের চোখেই দেখবেন।" কথাগুলো ভারতের অন্যতম সেরা ফুটবল কোচ প্রদীপ ব্যানার্জির।

সমরের কথামত সমরের "বড় হওয়া" দেখার অপেক্ষাতেই রইলাম আমরা।

ভুল শুধরে নাও : ২৭শে আগস্টের আনন্দমেলায় 'ছয় ছক্কা' লেখাটিতে কিছু ভুল আছে। বোলাস করেছিলেন ১৪০ রান। সোবার্স যখন উইকেটে আসেন তখন পার্কিন ১০ রানে অপরাজিত ছিলেন। পঞ্চম বলটা ছয় হয়েছিল লং অনের মাথার ওপর দিয়ে। আর ট্রেন্টব্রিজ ক্রিকেট মিউজিয়াম ইংল্যান্ডে, ওয়েস্ট ইন্ডিজে নয়।

১০ই সেপ্টেম্বর আনন্দমেলায় 'জোড়া শূন্য' লেখায় চন্দ্রশেখরের পাঁচটি জোড়া শূন্যের জায়গায় চারটি জোড়া শূন্য হবে।

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থ

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

কিং-ই রাজা

আলোক দাশগুপ্ত

কয়েক মাস আগে জাকর্তা ঘুরে এসে এক সাংবাদিক বন্ধু মন্তব্য করেছিলেন, "এবারের বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ফাইনালের ফলাফল নিশ্চয় আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, না হলে একত্রিশ বছরের রুডি হরতনো তাঁর চেয়ে প্রায় আট বছরের ছোট লিয়েম সুই কিংয়ের বিরুদ্ধে এমন অনায়াসে জিততে পারতেন না!"

সাংবাদিক বন্ধুর কথাটি উড়িয়ে দিতে পারিনি। ব্যাডমিন্টনের প্রবাদ-পুরুষ রুডি হরতনো আটবার অল-ইংল্যান্ড খেতাব জিতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন, কিন্তু ওঁর দুর্ভাগ্য বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের কোনও আসর তখন বসত না বলে সরকারিভাবে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন আখ্যা পাননি। অতএব রুডি কাগজে-কলমে একবার অন্তত সবার সেরা হন—এটা বোধহয় অনেকেরই কাম্য ছিল। ব্যাডমিন্টন-পাগল ইন্দোনেশীয়রা চাইছিলেন তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড় রুডিই চ্যাম্পিয়ন হোন, কারণ লিয়েমের বয়স অল্প, একবার হেরে গেলে পরেরবার সুযোগ পাবেন, কিন্তু রুডির কাছে এটাই হয়তো শেষ সুযোগ।

ফলে, রুডি হরতনো বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় অনেকেই খুশি হয়েছিলেন। লিয়েম সুই কিংয়ের ব্যর্থতা তাঁর অনুরাগীদের ভাবিয়ে তুলেছিল। "এই তো সেদিন অল-ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে লিয়েম 'বাচ্চা'ছেলের মতো হারলেন ভারতের প্রকাশ পাড়ুকোনের কাছে। তবে কি কিংয়ের দিন ফুরিয়ে আসছে?"

কিন্তু কিং-ই যে এখন ব্যাডমিন্টনের রাজা সেটা তিনি আবার প্রমাণ করলেন লন্ডনের অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মাসটার্স টুর্নামেন্টে। ফাইনালে ১৫—১১, ১৫—৩ পয়েন্টে হরতনোকে হারিয়ে জিতে নিলেন তিন হাজার পাউন্ডের প্রথম পুরস্কার। ফলাফলই বলে দিচ্ছে, কিং হরতনোকে প্রায় দাঁড়াতেই দেননি। কিন্তু, অন্যান্য ম্যাচে হরতনোর কৃতিত্বকে ছোট করে দেখা উচিত হবে না। ডেনমার্কের মর্টন ফ্রাট হ্যানসেনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গেমে

লিয়েম সুই কিং

রুডি হরতনো

ক্লিয়ারাসিল
এবার
এক নতুন অন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যাকে

অকাল নিবাস-গুরুধাম
শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থাগার

তরুণ মুখকে সুন্দর রাখতে ক্লিয়ারাসিল,
ব্রণ সাফ করে দেয় ও তা ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া

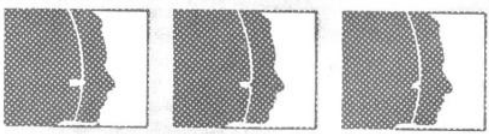

১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়
ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফর্মুলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।

২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়
ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য করে, ফলে ক্ষতিকর ভাবে টিপে বার করতে হয় না।

৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়
অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

ব্রণ হ'ল যৌবনে পা রাখার এক অঙ্গবিশেষ—
তখন আপনার চাই সামান্য একটু ধৈর্য্য…
আর ক্লিয়ারাসিল!

ক্লিয়ারাসিল বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম

OBM-5071-BN

একসময়ে ৬—১২ এবং তারপর ১৪ পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে যে-ভাবে ১৭—১৪ পয়েন্টে জিতেছেন তা একজন জাত খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব।

রীতিমত লড়াই করে জাপানের ওশিকো ওনেকুরাকে হারিয়ে মেয়েদের চাম্পিয়ন হয়েছেন ডেন গৃহিণী লেনে কোপেন। কোপেন নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। কিন্তু গত বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপে উনি অপ্রত্যাশিত-ভাবে হেরে গিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ার উঠতি খেলোয়াড় ইভানার কাছে। মাসটার্স টুর্নামেন্টে এই জয় কোপেনের মনোবল ফিরিয়ে আনবে।

আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের একমাত্র প্রাইজ-মানি টুর্নামেন্ট মাসটার্স শুরু হয়েছে গত বছর থেকে। প্রথম খেতাব জিতেছিলেন ভারতের প্রকাশ পাড়ুকোন, তবে ইন্দোনেশীয় খেলোয়াড়রা গতবার অংশ নেননি।

এবারের প্রতিযোগিতায় বিখ্যাত সব খেলোয়াড়ই হাজির হয়েছিলেন। চারজন করে খেলোয়াড়কে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। এক দিকে ছিলেন কিং, প্রকাশ, ডেনমার্কের ফ্লেমিং ডেলফস এবং সুইডেনের জোহান্সন। অন্যদিকে হরতনো, ফ্রস্ট হ্যানসেন এবং ইংল্যান্ডের রে স্টিভেনস এবং সুইডেনের টমাস খিলস্ট্রম। লীগ পদ্ধতির খেলায় কিং এবং হরতনো গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হন।

প্রকাশকে নিয়ে ভারতীয়দের অনেক আশা ছিল, কিন্তু প্রকাশ সে আশা পূরণ করতে পারেননি। গ্রুপ ম্যাচে অপ্রত্যাশিত-ভাবে হেরে যান জোহান্সনের কাছে। গত সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে প্রকাশ একে-একে মাসটার্স, ডেনিশ ওপেন, সুইডিশ ওপেন এবং অল ইংল্যান্ড খেতাব জিতেছিলেন। তখন উনি দারুণ ফর্মে ছিলেন। প্রকাশের ফর্ম কি তবে এখন পড়তির দিকে? এর উত্তর খোঁজার জন্যে এখন আমাদের আগামী অল-ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

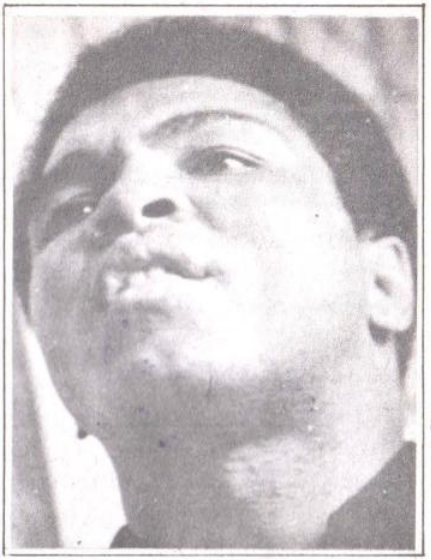

ফোটো অনক মিত্র

মহম্মদ আলি যে ল্যারি হোমসের কাছে হেরে গেছেন, তা তোমরা জানো। আগামী সংখ্যায় লড়াইয়ের বিস্তারিত খবর পাবে।

মণিমেলার খবর

প্রতি বছরের মতো এবারও শিশু ও কিশোরদের জন্য ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্কুলের প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

মণিসন্দেশ

প্রভাতফেরি, শোভাযাত্রা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং নানারকম ব্যায়াম, ব্রতচারী, লোকনৃত্যের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করে মণিমেলাগুলি। অরবিন্দ জয়ন্তী ও রাখীবন্ধন উৎসবও পালিত হয়।

অনিন্দিতা মণিমেলার বার্ষিক উৎসবে মণিভাইবোনেরা "মৌমাছি"কে অভিনন্দন জানায়। এই উৎসবে স্থানীয় আরও কয়েকটি মণিমেলা অংশ নেয়। স্বামীজী মণিমেলার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপিত হয় সম্প্রতি।

আঞ্চলিক সংবাদ

আসানসোল আঞ্চলিক কাবাডি প্রতিযোগিতায় ভাইদের দলে বিজয়ী হয় সোনারতরী মণিমেলা এবং বোনেদের দলে রেলপার মণিমেলা।

আমাদের কথা

আমরা কেউ ভালবাসি রূপকথা, কেউ অ্যাডভেনচার, কেউ পড়ি

শিকার কাহিনী, কেউ কল্পবিজ্ঞান, কারো ভাল লাগে জীবনী, কারো পুরনো কলকাতা, কেউ চাই ছড়া আর কবিতা, কেউ

শিখতে চাই ছন্দ, কেউ বানান, কেউ মজে থাকি বিজ্ঞানের মজায়, কেউ ভূতের গল্পে, হাসির গল্প

ছাড়া ছুঁই না কেউ, কেউ গোয়েন্দাগল্প ছাড়া ছুঁয়েও দেখি না। আমাদের

নানান বয়েস, নানান রকমের পছন্দ; আর আমাদের সব-রকম

পছন্দের বই যাঁরা ছাপেন তাঁদের নাম

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৯ ফোন ৩৪৪৩৬২

কম কথায় বলা

কুন্তক

দোষের মধ্যে হয়েছিল এই যে, শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প নিয়ে আড্ডা জমে উঠেছিল সকালবেলায়। টুম্পিও বলে গল্প, নন্তুও, আমিও। সকলেই প্রায় একসঙ্গে কথা বলছি, সকলেই গড়িয়ে পড়ছি হেসে। তক্ষুনি হঠাৎ শোনা গেল বৌদির গলা ঃ সকালবেলাতেই ঘরের মধ্যে একেবারে হাট বসে গেছে!

একটু থমকে গেলাম আমরা।

তারপরেই টুম্পি বলল হেসে ঃ ইস, আরেকটু হলেই মা একটা অলংকার দিয়ে ফেলেছিল!

সে আবার কী?

যদি বলতে 'হাটের মতো গোলমাল লাগিয়েছিস,' তাহলেই বেশ একটা সাজিয়ে বলা হত।

আমি জিজ্ঞেস করি ঃ সাজিয়ে বলেনি বুঝি তোর মা?

কোথায় আবার সাজাল?

বাঃ, এ তো একেবারে সেরা সাজানো! পুরোই সেটা লুকিয়ে ফেলা হয়েছে বলে ধরতে পারছিস না ঠিক। মনে আছে অনেক-দিন আগে বলেছিলাম, চাঁদ আর মুখের মিলটাকে কত ভাবে বলা যায়? আচ্ছা থাক, চাঁদ বললে নন্তু আবার রাগ করবে। তাহলে ধর—কী ধরবি—ধর, জটার মতো মেঘ। কতভাবে মেলানো যায় এ দুটো ছবিকে?

কতভাবে? বলছি। জটার মতো মেঘ। মেঘ যেন জটা। মেঘের চেয়ে ঘন জটা, নয় তো, জটার চেয়ে ঘন মেঘ। আচ্ছা, শুধু ঘনতার জন্যই কি মেলানো হচ্ছে দুটোকে?

কত কিছুর জন্যই হতে পারে! ঘনতা হতে পারে, রঙের জন্যেও হতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা হতে পারে তা নিশ্চয় জলের জন্য।

জলের জন্য?

জলের জন্য নয়? জটা বললেই আমাদের মনে শিবের জটার কথাটা চলে আসে না হঠাৎ? সেখানে যে বাঁধা ছিল গঙ্গা, সেই গঙ্গার কথাও? জটা খুলে দিলেই যেমন গঙ্গার ধারা, মেঘ থেকে তেমনি—

বুঝেছি বুঝেছি। আচ্ছা, আরো বলব? মেঘ, না জটা? মেঘ নয়, জটা। জটা নয়, মেঘ। এই তো। আর কত বলা যায়!

নন্তু বলল ঃ বা রে টুম্পি, শেষটাই বললি না? রূপক, রূপক। মেঘজটা বা মেঘের জটা। আরে তাই তো! আমার যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাও মনে পড়ে গেল একটা ঃ মেঘের ধূম্র জটা। খুলে খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে/অরণ্যে সাড়া—'। ঠিক আছে?

খুব ঠিক আছে। এইবার শোন, এরও চেয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে যদি মেঘকে লক্ষ করে শুধুই বলিস 'জটা', তাহলেও কি একটা অলংকারই হল না? যার কথা বলা হচ্ছে, সেটাকে শুধু চেপে যাওয়া হল।

ওই যেমন বন্ধুরা এ ওকে বলে 'চাঁদ'?

টুম্পি বলল ঃ আচ্ছা, ওই-যে-সব বলে, ঘুঘু দেখছ ফাঁদ দেখোনি, তখনও তো তাহলে এরকমই ব্যাপার? সত্যি তো আর ঘুঘু বা ফাঁদের কথা বলা হচ্ছে না এখানে? অন্য কিছু বোঝাবার জন্যই তো?

ঠিকই তো। প্রবাদ-প্রবচনে প্রায়ই এমন হয়। তাই তোর মা যখন বলল যে, হাট বসে গেছে, তার মধ্যেও সাজিয়ে বলাই আছে। কেবল, একটু ঠেসেঠুসে, একটু কম কথায় বলা হয়েছে, এই আর কী!

বেশি কথা বলা মা পছন্দ করে কিনা, তাই। আমরা তো বাচাল, আমরা হলে বলতাম, 'হাটে যেমন লোকে চ্যাঁচামেচি করে, ঘরের মধ্যে সেইরকম চ্যাঁচাচ্ছ কেন তোমরা?'

পুরো এই কথাবার্তার পর বৌদির মন্তব্য শোনা যায় আবার ঃ মার সঙ্গে কথা বলার কী ছিরি! ঘোর কলি! (ক্রমশ)

বেশী সাশ্রয় ও বেশী সাদা চান
তো সাবানের কথা ভুলে যান, আনান
সুপার৭৭৭
ডিটারজেন্ট বার
•সাবানের চেয়ে ১২ গুণ বেশী শক্তিশালী, বেশী সাশ্রয়ী!
•অপ্টিক্যাল হোয়াটেনার যুক্ত!!
দুনিয়ার ১লা নম্বরের
ডিটারজেন্ট
কাপড় ধোয়ার বার
সুপার৭৭৭
ময়লার
বিরোধী,
শুভ্রতার
শক্তি
সুপার 777
SUPER 777
SWASTIK
Shilpi DM 13A/80 Ben

পেছনে তাকানো

প্রসাদ

চামেলিদের গল্প যেমন এগিয়েছে, তেমনি আমাদের ইংরেজি শেখাও একটু একটু করে খানিকদূর এগিয়ে এসেছে। এবারে একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক। যে-সব ছেলে-মেয়ে একেবারে প্রথম থেকে 'সহজে ইংরেজি' পড়ছ না, এতে তাদের সুবিধে হবে, আর যারা প্রথম থেকেই পড়ছ, তাদেরও আগেকার কথাগুলো ঝালিয়ে নেওয়া হবে। তারপরে আবার আমরা এগোতে আরম্ভ করব।

গোড়ার কথা দিয়ে শুরু করি ঃ

Chameli is a girl.
Chambal is Chameli's brother.
Chameli's father is a physician.

গল্প যখন আরম্ভ হল তখন আমরা কী দেখছিলাম ?

Chameli is in bed.
Her cat Araballi is in bed with her.

তখনকার দৃশ্যের বর্ণনা ঃ

Chameli is talking to Araballi.
She's asking Araballi to get off the bed.
She's telling Araballi it's time for her to get up.

যারা প্রথম থেকে 'সহজে ইংরেজি' পড়ছ তাদের তো এ-সব জানা। যারা জানতে না তারা কী কী প্রশ্ন করলে এ-সব কথা জানতে পারতে ?

Who is Chameli?
Who is Chambal?
What is Chameli's father.
Where is Chameli?
What is Chameli doing?
What is she asking Araballi to do?
What is she telling Araballi?

কিন্তু এ-সব তো অনেকদিন আগেকার কথা, কাজেই সে-সব কথা এখন বলতে গেলে এইরকম ভাবে বলতে হবে ঃ

Chameli was seven years old when the story began.

She was in bed at the time.
Araballi, her cat, was in bed with her.
She was talking to Araballi.
She was asking Araballi to get off her bed.

তেমনি, আগেকার কথা প্রশ্ন করে জানতে হলেও এইরকম ভাবে করতে হবে ঃ

Who was Chambal?
Where was Chameli?
What was she doing?

তা, এখন তো চামেলি বিছানায়। এর পরে কী হবে ?

Chameli will get up from bed.
She will get ready for school.
She will eat her breakfast.
Her school-bus will arrive soon.

*

Does Chameli go to school?
Yes, she does.
Will she go to school today?
Yes, she will

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

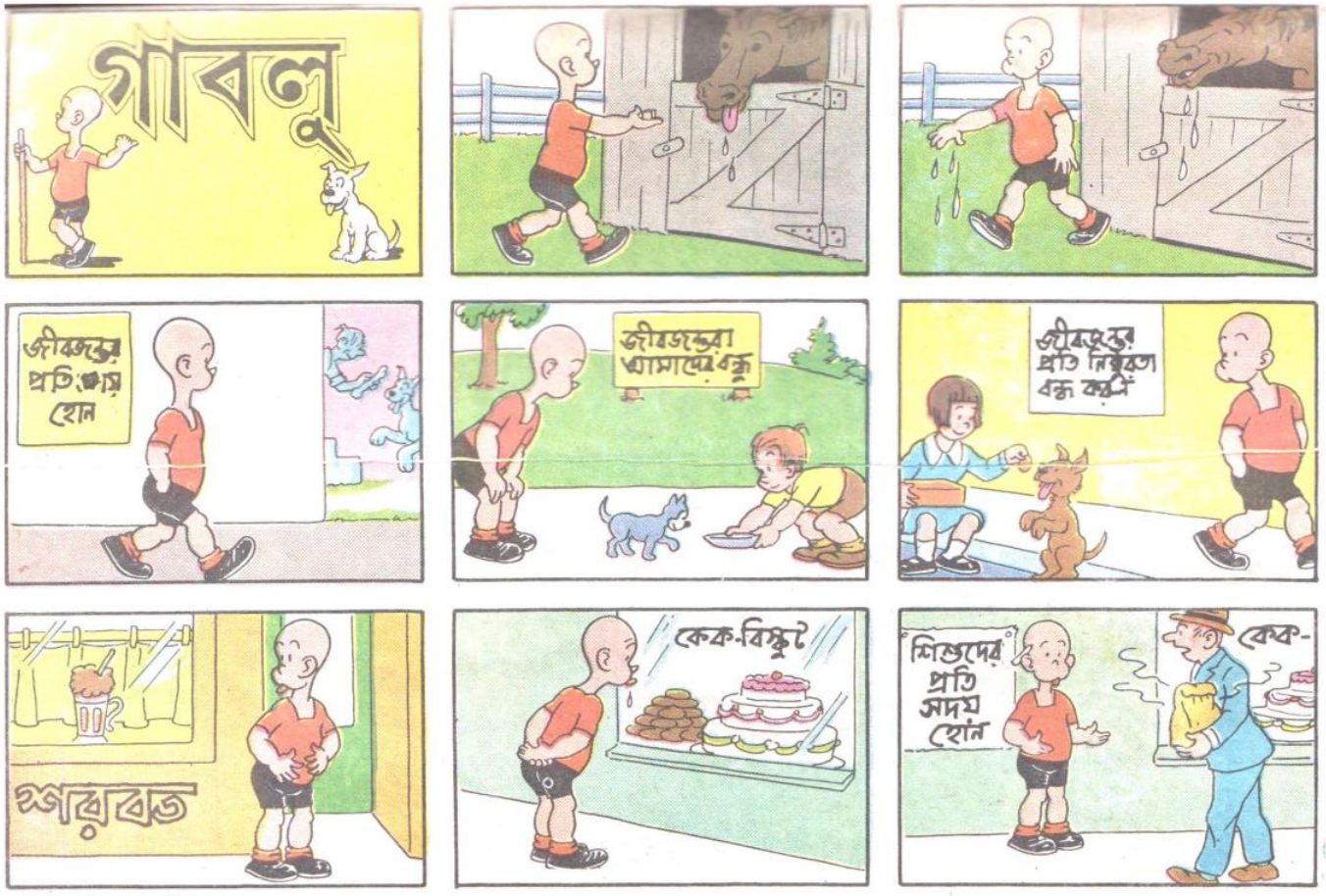

গাবলু
জীবজন্তুর প্রতি দয়া হোন
জীবজন্তুরা আমাদের বন্ধু
জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধ করুন
শরবত
কেক-বিস্কুট
শিশুদের প্রতি সদয় হোন
কেক-

লোরেটো হাউসের ভাইস প্রিন্সিপাল কী বলেন

সুভদ্রা-ঊর্মিলা মজুমদার

এক ঝকঝকে সকালে কলকাতার মিডলটন রো'র লোরেটো হাউসে আমরা পেঁছলাম। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল সিস্টার মণিকা।

কথায় কথায় তিনি জানালেন, ১৮৪২ সালে এই হাউসের গোড়াপত্তন হয়। এখন এক হাজারের ওপর ছাত্রী স্কুলটিতে পড়ছে। প্রতি বছরই আই.সি এস ই পরীক্ষায় এই স্কুলের ফল খুব ভাল হয়। ১৯৭৯ সালে সত্তরজন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। এদের মধ্যে পাস করেছে সকলেই। সত্তরজনের মধ্যে তেইশজন কুড়ি পয়েন্টের কম পেয়েছে, বত্রিশজন কুড়ি থেকে ত্রিশ পয়েন্ট পেয়েছে, এবং পনেরজন ত্রিশ পয়েন্টের ওপর পেয়ে পাস করেছে।

"আই. সি. এস. ই. পরীক্ষায় কীভাবে পড়লে বেশি নম্বর পাওয়া যায়?"

প্রশ্নটির উত্তরে সিস্টার মণিকা বললেন, "প্রথমেই পাঠ্যবই পড়ে নিতে হবে খুব ভাল করে। তারপর অলঙ্কারবর্জিত ভাষায় সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।" দিল্লি বোর্ডের অন্যান্য পরীক্ষার মতো আই সি এস ই-তে মুখস্থ করে ভাল ফল করার অবকাশ কম। বিষয়বস্তু পড়া এবং বোঝার ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়।"

ইংরেজিতে বেশি নম্বর পেতে হলে কী ভাবে পড়াশোনা করা উচিত জানতে চাইলে সিস্টার বললেন, "সহজ, সরল ভাষায় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে রচনা লেখার অভ্যাস করলে ভাষার জড়তা কেটে যায়। আর, পরীক্ষায় রচনা লেখার সুবিধে হয়। লেখার সময় ছোট এবং সহজ বাক্য না লিখলে ভুল হবার সম্ভাবনা বেশি। আর, ভুল হলেই নম্বর কমে যায়। লিটারেচারের জন্য অবশ্য জোর দিতে হবে তথ্যের ওপর। এর জন্য প্রয়োজন পাঠ্যবই খুব মন দিয়ে বারবার পড়া। প্রয়োজনমতো কিছু-কিছু অংশ মুখস্থ করে রাখলেও পরীক্ষায় সুবিধে হতে পারে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অনেক ছাত্রছাত্রী মনে করে, লিটারেচার পরীক্ষায় শুধুমাত্র পাঠ্যবই পড়াই যথেষ্ট। ধারণাটি ঠিক নয়। পাঠ্য-বই ছাড়াও কিছু-কিছু রেফারেন্স বই পড়া প্রয়োজন।

"শেক্সপীয়রের নাটকগুলিতে কিছু কিছু পৌরাণিক নামের উল্লেখ আছে। এই নামগুলির সূত্র ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণার জন্য লাইব্রেরিতে গিয়ে রেফারেন্স বই পড়ার প্রয়োজন। পড়ার পরে আসে লেখার কাজ। ইংরেজি বলতে পারলেই ইংরেজিতে প্রশ্নোত্তর লেখা যায় না। প্রশ্নোত্তর লেখার অভ্যাস করতে হবে খুব বেশি করে। পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অল্প সময়ের মধ্যে প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর আশা করা হয়। ছোট-ছোট প্রশ্নের উত্তর লেখার অভ্যাস থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবেই। আই সি এস ই টেস্টপেপার্সে এই ধরনের প্রশ্ন পাওয়া যাবে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক আছে, তার সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে।

ইতিহাস সম্পর্কে সিস্টার মণিকা বললেন, "ইতিহাসে বিষয়বস্তুর ওপর জোর দিতে হবে। পাঠ্যবই এবং রেফারেন্স বই পড়া প্রয়োজন ভাল করে। ইতিহাস পড়ার সময় ম্যাপ ধরে পড়লে ঐতিহাসিক ঘটনা স্থলগুলি মনে রাখতে সুবিধে হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি বিশেষ-বিশেষ সন-তারিখের

একটা তালিকা তৈরি করে চোখের সামনে রাখে, মনে রাখা সহজ হয়ে যায় অনেকখানি। কিন্তু শুধু পাঠ্য ও রেফারেন্স বই পড়লেই চলবে না, লেখার ওপর জোর দিতে হবে।

ভূগোল পরীক্ষায় কীভাবে ভাল নম্বর পাওয়া যায় জানতে চাইলে সিস্টার বললেন, "ভূগোল পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তরে আনুষঙ্গিক ভৌগোলিক পরিভাষার (Geographic term) উল্লেখ অত্যন্ত প্রয়োজন। সাধারণত পরীক্ষকরা উত্তরের ভাষার দিকে তেমন নজর দেন না। সঠিক ভৌগোলিক পরিভাষার উল্লেখ করতে পারলে বেশি নম্বর পাওয়া কঠিন নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি প্রতিটি পরিচ্ছেদ পড়ার সময় ভৌগোলিক পরিভাষার তালিকা তৈরি করে, উপকৃত হবে।"

অঙ্কের বিষয়ে সিস্টার বললেন, "আই সি এস ই পরীক্ষায় অঙ্কে দুটি পেপার। প্রতি পেপারে আড়াই ঘন্টা সময় পাওয়া যায়। পরীক্ষায় অন্তত কুড়িটি প্রশ্ন আবশ্যিক। এত কম সময়ে এত অঙ্ক কষতে হলে আগে থেকে অভ্যাস করা খুবই প্রয়োজন।

বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সিস্টার বললেন, "প্রথমেই পাঠ্যবই খুব মন দিয়ে পড়তে হবে। তারপর দরকার টেস্ট-পেপার্স দেখে প্রশ্নের উত্তর লেখা অভ্যাস করা। বিজ্ঞানে এমন ধরনের প্রশ্ন হয় যেগুলির উত্তর দিতে গেলে শুধু মুখস্থ করলেই চলবে না। পাঠ্য-বিষয় বুঝে পড়া প্রয়োজন।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

লোরেটো হাউসের কৃতী ছাত্রী মালিনী ঘোষ। ১৯৭৯ সালের ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ নম্বর পেয়ে টেনে উঠেছে। মালিনী থাকে আলিপুরে। ওর বাবা কোল ইন্ডিয়ায় কাজ করেন, মা শিক্ষকতা করেন স্কুলে। ইতিহাস ও ভূগোল মালিনীর প্রিয় বিষয়। মালিনী বরাবরই এই দুটি বিষয়ে ভাল ফল করে। ওর ইচ্ছে বড় হয়ে অর্থনীতি বা কমার্স নিয়ে পড়া।

স্কুলের দিন মালিনী দু'ঘন্টা পড়ে। ছুটির দিনে পড়ে আরও এক ঘন্টা বেশি। ইংরেজি পড়ার সময় মালিনী প্রথমে খুব মন দিয়ে পাঠ্যবই পড়ে নেয়। তারপর প্রয়োজন মতো কিছুকিছু অংশ মুখস্থ করে।

ইতিহাস মালিনীর প্রিয় বিষয়। ও বলল, ইতিহাস পড়ার সময় খুব বেশিক্ষণ থেকে বই নিয়ে বসে থাকতে হয় না। অল্প সময়েই পড়া তৈরি হয়ে যায়। মালিনী ক্লাসে নিয়মিত নোটও নেয়। খবরের কাগজ পড়ে, ঐতিহাসিক প্রবন্ধও পড়ে। ভূগোল পড়তেও মালিনীর ভাল লাগে। পাঠ্যবই পড়া ছাড়া মালিনী টেস্ট পেপার্স দেখে প্রশ্নোত্তর লেখে। ম্যাপ-পয়েন্টিং অভ্যাস করে।

মালিনী রেফারেন্স বই পড়ে ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রিতে। ফিজিক্সে পাঠ্যবই ছাড়াও টেস্ট পেপার্স থেকে প্রব্লেম করার অভ্যাস করে। ডায়াগ্রাম আঁকে ও লেবেলিং করে।

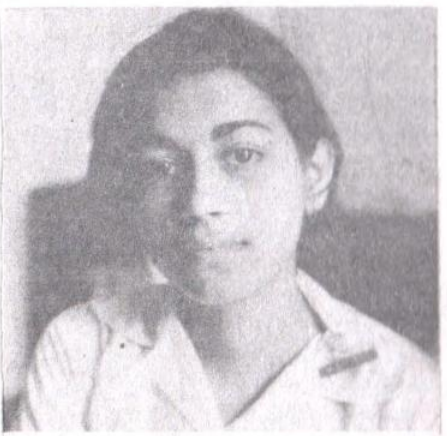

কেমিস্ট্রিতে পাঠ্য-বইয়ের বাইরে Holdemess and Lambert-এর লেখা বই পড়ে মালিনী বিশেষ উপকৃত হয়েছে।

অঙ্কে মালিনী ওর মায়ের কাছে সাহায্য পায়। অঙ্কের ওপর ও আরও জোর দিতে চায়। ও মনে করে, সময় ধরে অঙ্ক করলে ওর খুব সুবিধে হবে।

বাংলা পড়ার সময় মালিনী প্রথমে পাঠ্য-বই বারবার পড়ে নেয়, তারপর ব্যাখ্যা এবং প্রশ্নোত্তর লেখে।

বাইরের বই পড়তেও খুব ভালবাসে। Daphne du Maurier ওর প্রিয় লেখিকা। মালিনী স্ট্যাম্প জমায়, বাস্কেটবল, থ্রোবল ও ব্যাডমিনটন খেলে। অবসর-সময়ে গান শোনে। আনন্দমেলা ওর ভাল লাগে।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

আয় রে, পাখি,
জল খেয়ে যা!

গাবলু

গোরুর গলকম্বল

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌকোর মধ্যেই একটু-আধটু বাড়িয়ে কমিয়ে ঠিক-ঠাকভাবে গোরুর মুখে ঘোরা-ফেরা লক্ষ করো।

এইভাবে প্রত্যেক জন্তু-জানোয়ারকে দেখলে দেখবে আঁকা কত সোজা হয়ে যাচ্ছে।

কাগজের খেলনা : বাহারি ঝোলনা-৪

কারিগর

এবার সমবাহু ত্রিভুজ নয়—একই মাপে দুটি গোল আঁকো, আর দুটিকেই সমান পাঁচ কোণে ভাগ করে নাও (নমুনা দেখো)।

ফুলের মতো পাঁচকোণের নকশার মাঝখানে যে লাল দাগগুলি টানা আছে তার ওপর নরুনের আলতো চাপে দাগ দিয়ে ঠিকঠিকভাবে ভাঁজ করলে দেখবে ২০-কোণ-বিশিষ্ট বাহারি ঝোলনা কেমন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এর প্রত্যেক ভাগে তোমার ইচ্ছেমতো নকশা দিয়ে সাজাতে কোথাও বাধা নেই।

জেনে রাখো—(১) দুটি পাঁচ কোণ কেমন ভাবে জুড়ে থাকবে নকশায় দেখে নাও (ক+ক অংশ)। (২) কোণগুলিতে রংবাহারি ফিতে ব্যবহার করতে পারো।

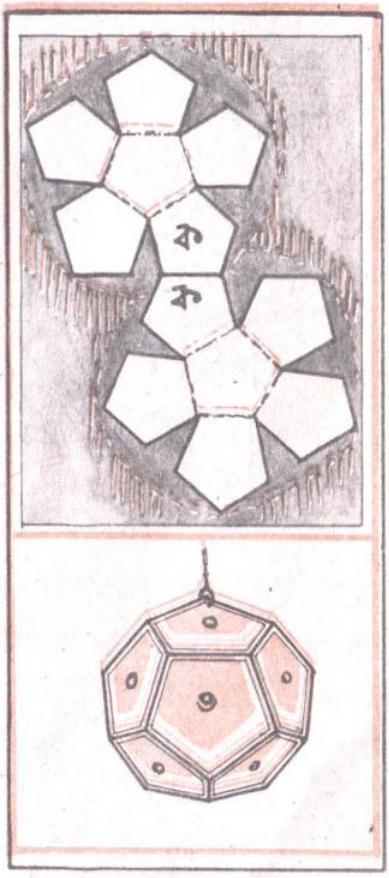

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট টয়লেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্টে এমনই চমকদার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে!

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝকঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী!

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন:

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি!

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.40-1810 BG

জীবন আর হনু জানাচ্ছে

মানুষের সেরা কৃতিত্বের খবরাখবর

চিকাগো শহরের 'সীয়ার্স টাওয়ার' দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। এই ১১০ তলা বাড়িটার উচ্চতা ১৪৫৪ ফুট। এতে আছে মোট ১০৩ টা লিফ্ট যা ১৬৭০০ লোক ব্যবহার করতে পারে।

রাশিয়ার 'মাদার ল্যান্ড' মূর্তিটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মূর্তি। এটি ২৭০ ফুট উঁচু, যা কুতুব মিনারের চেয়েও ১৮ ফুট কম।

মার্কিনদেশীয় 'অ্যাপোলো-১৩' (১৯৭০) যখন চাঁদের পিঠে নেমেছিল, তখন তার অভিযাত্রীরা, মানুষের পৃথিবী থেকে দীর্ঘতম দূরত্বে (২৪৮,৬৬৫ মাইল) পৌঁছোনোর কৃতিত্ব অর্জন করেছিল।

জলের নীচে গভীরতম অভিযান করেছিল 'পিকার্ড ও ওয়ালেস'। ১৯৬০ সালে ওঁরা ১৫৮২০ ফুট গভীরে মহাসমুদ্রের তলদেশে পৌঁছেছিলেন।

দুনিয়ার দ্রুততম চাকাওয়ালা গাড়িটার নাম 'ব্লু ফ্লেম', আমেরিকায় উটা'র বনেভিলে সল্ট ফ্ল্যাটস'-এ ১৯৭০ সালে এটা ঘন্টায় ৬৫০ মাইল পর্যন্ত বেগে ছুটেছিল।

জীবন-বীমা আপনার ভবিষ্যতের সুরক্ষার সবচেয়ে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত উপায়। এ সম্পর্কে বিশদ জেনে নিন।

ভারতীয়
জীবন বীমা নিগম

Cunha-LIC-1001-BEN

পরবর্তী সংখ্যা:- দুই সংবাদদাতা পৃথিবীর আজব চেহারার খবর দেবে!